চাঁদমামা
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
1 Re

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Photo by: **M. Y. BENDRE**

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁত উঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন : ডল্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ডলটন্ এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬
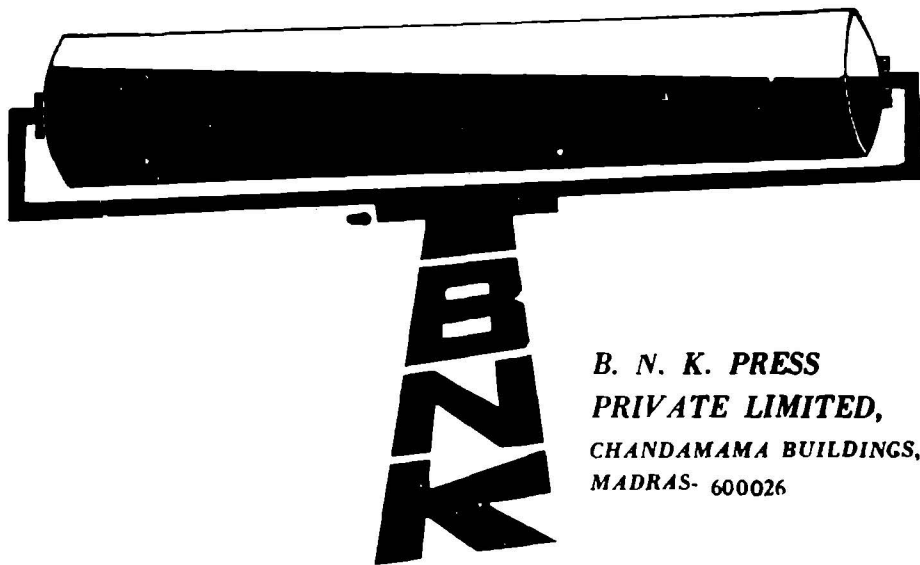
রাম আর শ্যাম এর পপিন্স-চোর ধরা
গভীর রাত, চুপচাপ-
অঘোরে ঘুমোয়
রাম-শ্যাম,
চোর এল
ঘরে-রাম-শ্যাম
ভয়ে মরে
চোর চায় না ধন-
পপিন্স 'পরেই
তার মন
কুকুর ডাকে ভৌ ভৌ-
চোর কাঁদে ভেউ ভেউ
রাম ওঠে চেঁচিয়ে-
চোর গেল পাকড়িয়ে
চাখ্‌তে হবে জেলের
মজা- তোর জন্যে
উচিত সাজা-
মহাখুসী রাম-শ্যাম-
বাক্সভরা পপিন্স
লাভ
রসেভরা
মনেরমত
মজাদার
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর-
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু
ও মৌসম্বী
প্রত্যেক প্যাকে ১৩টি লজেন্স
PARLE POPPINS
পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথায় মানুষের জীবনে যে চরম সত্য বিরাজমান তার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্ব যেন টাকার অধীন। সুখ যেন টাকার উপর নির্ভর করে। এই মানব সমাজে যার টাকা বেশি তার খ্যাতি বেশি। অথচ টাকাই যে সমস্ত পাপ কাজের মূল তা সবাই জানে কিন্তু ভুলে যায়। 'আসল কারণ' কাহিনীতে এই অর্থ-নির্ভর দুনিয়ার কথাই রয়েছে। এছাড়া অন্য যে সব কাহিনী আছে সেগুলি পড়লেও বেশ আনন্দ পাবে।

খণ্ড ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সংখ্যা ৮

অমর বাণী

গুণাঃ খলু গুণা এব
ন গুণা ভূতেহিতবঃ
ধনসঞ্চয়কর্ত্রণি
ভাগ্যানি পৃথকেবহি। ॥ ১ ॥

[সদ্‌গুণ শুধু সদ্‌গুণই। এ ঐশ্বর্য প্রদান করে না। ধনপ্রাপ্তির জন্য ভাগ্য নামক অন্য এক জিনিস আছে।]

আত্মায়ত্তে গুণগ্রামে,
নৈর্গুণ্যম্ বচনীয়তা,
দৈবয়ত্তেষু বিত্তেষু
পুংসাম্ কা নাম বাচ্যতা ? ॥ ২ ॥

[সদ্‌গুণ স্বশক্তি দ্বারা সম্পাদিত। সদ্‌গুণ না থাকা খারাপ, তবে ভাগ্য ফলে যে সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয় তার ধন না পেলেও ক্ষতি নেই।]

যস্যাস্তি বিত্তম্ স নরঃ কুলীনঃ,
স পণ্ডিত, স্স শ্রুতবান্, বিদিজ্ঞঃ,
স এব বক্তা, স চ দর্শণীয়ঃ,
সর্বেগুণাঃ কাঞ্চন মাশ্রয়ন্তি। ॥ ৩ ॥

[যার কাছে ধন থাকে সেই কুলীন, সেই পণ্ডিত, সেই শাস্ত্রজ্ঞ, সেই কর্তব্যজ্ঞানী, সেই লোকপ্রিয়, সেই সুন্দর, এমন কি সমস্ত সদ্‌গুণও ধনের সঙ্গেই থাকে।]
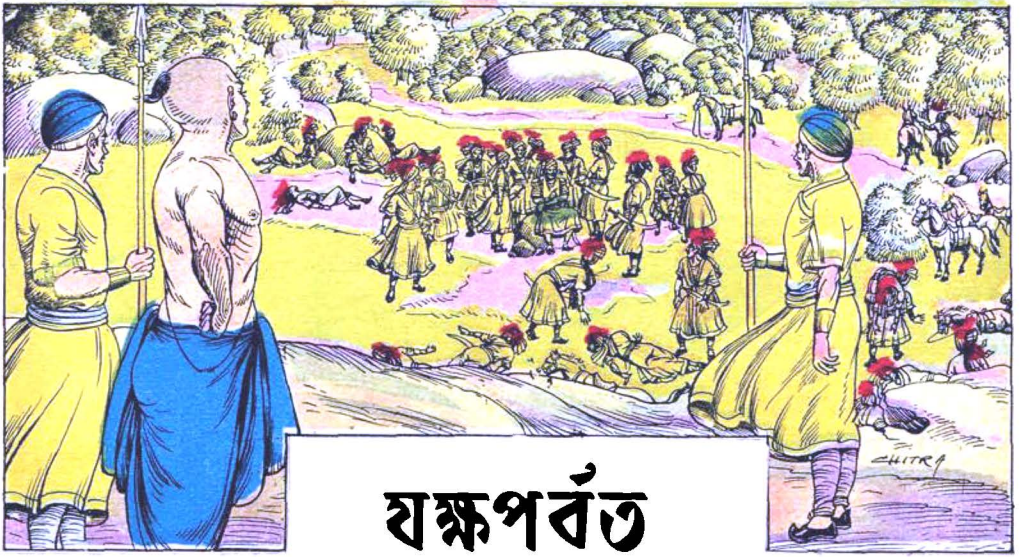
যক্ষপর্বত

উনিশ

[বীরপুরের রাজার আদেশ পেয়েই সেনাপতি পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঐ পাহাড়ের কাছে গিয়ে স্বর্ণাচারিকে অস্ত্র ফেলে দিতে হুকুম দিল। কিন্তু সমরবাহুর অনুচররা পাহাড়ের উপর থেকে বল্লম ছুঁড়ে মারে। একটি বল্লমের আঘাতে বীরপুরের সেনাপতি আহত হয়। তারপর…]

সমরবাহুর অনুচরদের ছুঁড়ে মারা একটি বল্লম তীব্রবেগে এসে বীরপুরের সেনাপতির কাঁধে বিধেছিল। সেনাপতি সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যায়। তখন তাকে নিয়ে সেনাবাহিনীর একজন লোক তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে। সেনাপতির কাঁধে পটি বেঁধে দেয় সেনাটি।

স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরকে প্রশংসা করে বলে ওঠে, "প্রথম আঘাতেই আমরা শত্রুকে নাজেহাল করতে পেরেছি। গুনতে গেলে আমরা সংখ্যায় মাত্র ছাব্বিশ জন আছি কিন্তু শত্রুর এই আঘাতেই ধারণা হবে যে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি আছি। এই আঘাত হানার ফলে শত্রু আমাদের এই পাহাড়ের উপর ওঠার সাহস করবে না।"
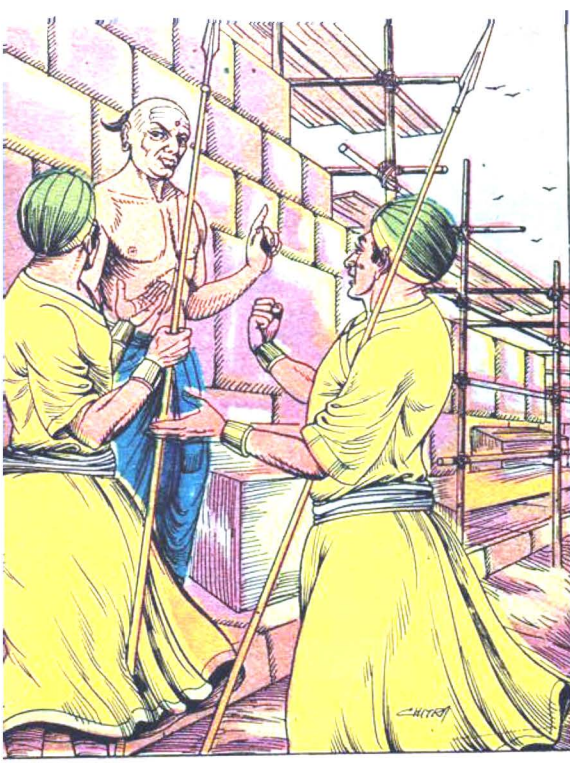
একথা শুনেই সমরবাহুর একজন অনুচর বলল, "মহামন্ত্রী, শত্রু যদি পাহাড়ে উঠতে চায় তো ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে যে বনবাসী এসেছে তারা শত্রুর উপর বাঘ এবং সিংহ লেলিয়ে দেবে।"

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নিচে বীরপুরের যে সেনারা জমে ছিল তাদের দিকে একবার ভাল করে দেখে নিল। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ঘোড়ায় বসে ছিল। অন্যেরা আহত সেনাপতিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছ থেকে আদেশ বা নির্দেশ শোনার আশায়। আঘাতের ফলে কাতরাতে কাতরাতে সেনাপতি বোঝাচ্ছিল কিভাবে পাহাড়ের উপর উঠতে হবে।

সমরবাহুর দুজন সাহসী অনুচর স্বর্ণাচারির কাছে গিয়ে বলল, "মহামন্ত্রী, মনে হচ্ছে, শত্রুকে আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়। আপনি নির্দেশ দিলে আমরা তাদের আঘাত হেনে এই মুহূর্তে তাদের ঘোড়াগুলো দখল করে নেব।"

সমরবাহুর অনুচরদের সাহস দেখে স্বর্ণাচারির খুব আনন্দ হল। কিন্তু নিচে নেমে বীরপুরের সেনাদের আঘাত হানার ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল। স্বর্ণাচারি তাদের বলল, "দেখ, তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। সংখ্যার দিক থেকে ওরা আমাদের দশ গুণ আছে। পাহাড় থেকে আমাদের নাবতে দেখে ওরা মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যাবে এবং আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে সর্বনাশ করে ফেলবে। ভালকথা, আমাদের উটগুলো পাহাড়ের ওপাশের সমতল ভূমিতে সযত্নে রাখা আছে তো?"

"সমস্ত উট আমরা এক জায়গায় রেখে তাদের দেখাশোনার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছি। এখন আপনার নির্দেশ তাড়াতাড়ি জানান। আমাদের বল্লমের নাগালের বাইরে ওরা চলে যাচ্ছে। এখন কি ওরা সেখানে আর আমরা এখানে বসে থাকব? ব্যাস, এই হবে আমাদের কাজ?" বলল সমরবাহুর দুজন অনুচর।

ঐ অনুচর দুজন এমনভাবে কথা বলছিল যেন সেই মুহূর্তে স্বর্ণাচারির নির্দেশ পেলে তারা শত্রু পক্ষকে দূর করে দিতে পারবে। তাদের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে স্বর্ণাচারি কোন রকম রাগ প্রকাশ করল না। স্বর্ণাচারি একটু হেসে বলল, "তোমরা একথা ভেবনা যে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তোমরা কি ভাবছ যে ওদের সেনাপতি ঘায়েল হয়েছে বলে তার সেনারা সব পালাবে? জলে কি মাছ দুর্বল থাকে। বীরপুরের সেনারা বীরপুরের একটা অংশ অত সহজে ছেড়ে দেবে? পালালে বীরপুরের রাজা কি তাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করবে না? তাদের ফাঁসি দেবে না?"

স্বর্ণাচারি এসব কথা বলতে না বলতেই দেখা গেল বীরপুরের সেনারা ছোটাছুটি করতে লাগল এবং কয়েকজন ঘোড়ায় উঠে বসল। আর দুজন সেনা ধরাধরি করে সেনাপতিকে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। তার পাশে ছিল চার পাঁচজন সৈনিক। সেনাপতি ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের চারদিক দেখতে লাগল।

সেনাপতির চালচলন লক্ষ্য করে স্বর্ণাচারি বুঝল যে সেনাপতি পথ খুঁজছে সহজে পাহাড়ে ওঠার।

প্রত্যেকদিন সমরবাহুর লোকেরা যে পথে পাহাড়ে ওঠানামা করে সেই পথ ঐ সেনাপতির পক্ষে চিনে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়। একথা মনে হতেই তার বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠল। তখন স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরদের বল্লম ও পাথর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলল। আর নিজে গেল বাঘ ও সিংহ নিয়ে আসা বনবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে।
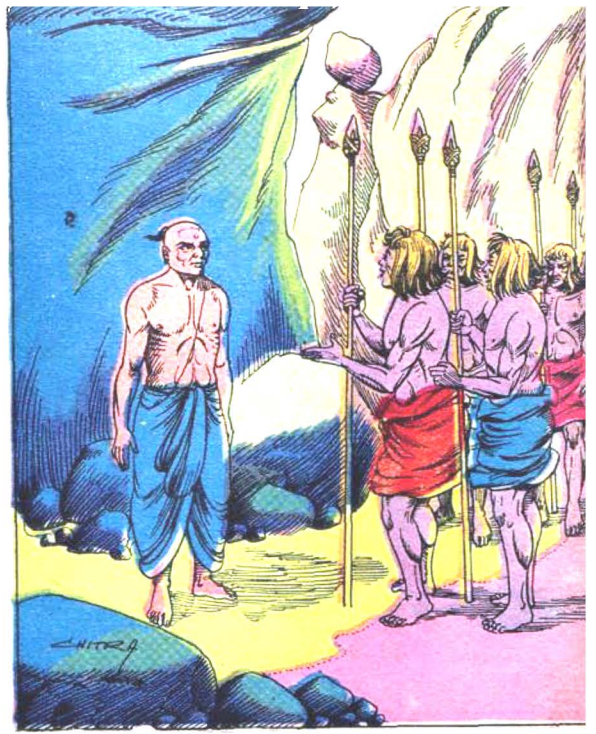
স্বর্ণাচারিকে তাদের দিকে আসতে দেখেই বনবাসীরা খুশী হয়ে তাকে নমস্কার করে দাঁড়াল। ওদের নেতা সামনে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করে স্বর্ণাচারিকে সবিনয়ে বলল, "মহারাজ, বীরপুরের সেনার চেয়ে আপনার সেনা বেশি ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে। তা নাহলে প্রথম আঘাতেই ওরা সেনাপতিকে আহত করতে পারত না।"
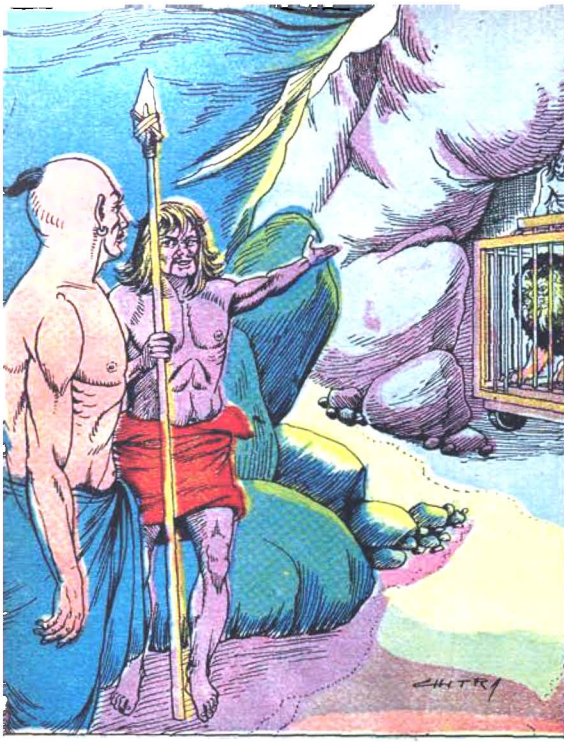
"ওদের সেনাপতি আহত হয়েছে, মরেনি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে আহত করার অর্থ ঐ পক্ষের সমস্ত সেনাকে সতর্ক করে দেওয়া। এখন শত্রু সেনারা চেষ্টা করছে পাহাড়ের উপর উঠে এসে আমাদের আক্রমণ করতে। পাহাড়ের উপর উঠে আসার যে পথ আছে সেই পথে তারা খুব সহজেই উপরে উঠে আসতে পারে। তোমরা আমার ইশারা পেলেই যাতে সিংহ এবং বাঘকে ছেড়ে দিতে পার সেইভাবে প্রস্তুত থেকো।" স্বর্ণাচারি বলল।

তারপর স্বর্ণাচারি সেই বনবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথের পাশের একটি গুহা ওদের দেখিয়ে দিল। বাঘ ও সিংহের পিঞ্জরাগুলো ঐ গুহার কাছে রাখা হল।

বনবাসীদের নেতা নিজের অনুচরদের দেখিয়ে স্বর্ণাচারিকে বলল, "মহারাজ, যে মুহূর্তে বীরপুরের সেনারা এদিকে আসবে, আমার অনুচররা কালমাত্র বিলম্ব না করে এই বাঘ ও সিংহকে এই পিঞ্জরা থেকে বের করে দেবে। এই প্রাণী আজ কতদিন খেতে পায়নি। মুহূর্তে যাকে সামনে পাবে তাকেই ছিঁড়ে খাবে।"

"ঐ জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার পর ওরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আবার ছুটে বনেও ঢুকে যেতে পারে। তা ঘটনা যাই ঘটুক তোমরা তোমাদের কাজ ঠিক সময়ে করবে। আর একটি কথা তোমরা যে আমাকে রাজা ভাবছ তা কিন্তু ঠিক নয়। আমি মন্ত্রী। তবে মনে রেখো আমাদের রাজা এই কাজের জন্য তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন।" স্বর্ণাচারি বনবাসীদের বলল।

স্বর্ণাচারি বনবাসীদের সাথে কথা বলে সমরবাহুর অনুচরদের কাছে ফিরে এসে বার বার নিচের দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে বীরপুরের সেনাপতি একটি পরিকল্পনা করে ফেলল। তারা পাহাড়ের উপর ওঠা শুরু করে দিল। পাহাড়ের উপর থেকে যখন পাথর এবং বল্লম তাদের উপর পড়তে

লাগল তখন তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ত আবার পরক্ষণেই উপরের দিকে উঠত। উঠতে উঠতে তীর ছুঁড়তো।

তাদের এই কৌশল দেখে স্বর্ণাচারি বুঝে নিল যে এইভাবে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এবং আত্মরক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত কিছু সৈন্য অবশ্যই উপরে উঠে আসবে। তখন নিজের মাত্র ছাব্বিশটি সৈনিক নিয়ে শত্রু পক্ষের সেনাদের পরাজিত করা সহজ হবে না। এই কথা ভেবে স্বর্ণাচারি অনুচরদের ডেকে বলল, "যুদ্ধ করার একটা কৌশল আছে। সব সময় যে শুধু এগিয়ে যেতে পারব তা নাও হতে পারে, পেছতেও হতে পারে। এমন বহু যুদ্ধ হয়েছে যেখানে এক পা এগিয়ে দু পা পেছতে হয়েছে। তাই যত বেশি সম্ভব শত্রুদের খতম করে এখান থেকে আমাদের গোপন পথে পালানো ছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না। আমাদের দুজন লোক আগে থেকেই ওখানে আছে। আরও দু-একজন গিয়ে উট নিয়ে প্রস্তুত থেকো।"

ইতিমধ্যে বীরপুরের সেনারা পাহাড়ের উপর ভালভাবেই ওঠা শুরু করে দিয়েছিল। সেনাপতি নিচে থেকে যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছিল ওরা সেইভাবে উপরের দিকে উঠছিল।
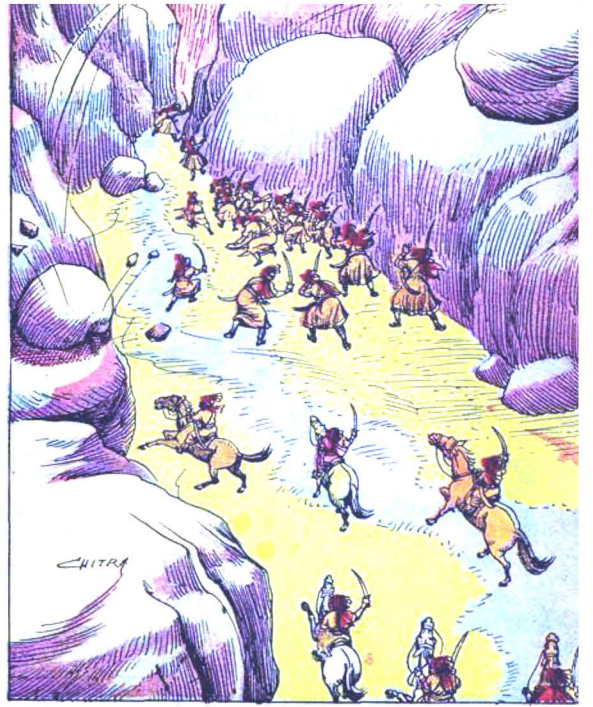
"হে উষ্ট্রবীরগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোন। বীরপুরের সেনাপতি মূর্খের মত তার ঘোড়সওয়ারকে পাহাড়ের উপর তুলছে। ওর ধারণা আমাদের উটগুলো পাহাড়ের উপরেই আছে। তোমরা এখন উপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দাও। ওরা হকচকিয়ে তাল সামলাতে পারবে না। ফলে ওদের অনেকে আহত হবে এবং কিছু লোক মারা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বল্লমও ছোঁড়।" স্বর্ণাচারি আদেশ দিল।

সমরবাহুর অনুচররা স্বর্ণাচারির নির্দেশ মত পাথর গড়িয়ে দিতে লাগল। গড়িয়ে দেওয়া পাথরগুলো প্রত্যেকটা যে শত্রুর উপর পড়ছিল তা নয়। কয়েকটা গড়াতে

তার পরীক্ষা এখনও হয়নি। ঠিক তখনই শুনতে পেল সিংহ ও বাঘের গর্জন। উঁকি মেরে দেখতে পেল ঐ জানোয়ারগুলো বীর-পুরের সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ঘটনার ফলে শত্রু সেনাদের মধ্যে দারুণ হাহাকার ও আর্তনাদ জেগে ওঠে। ওরা এই ধরণের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চোখের পলকে চার পাঁচজন সেনা বাঘ ও সিংহের আক্রমণের ফলে পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েকজন সেনা প্রাণ মুঠোয় করে পালাতে থাকে। ঘোড়সওয়ার সেনাদের মধ্যেও দারুণ অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিল। ঘোড়াগুলো যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। কিছু ঘোড়া আহত হয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেল। আর ওদের চাপে পড়ে বহু সেনা আহত হল। সেনাপতির নির্দেশ আর কেউ মানছিল না। অবস্থা দেখে সেনাপতিও হকচকিয়ে গেল। কি যেন হচ্ছে কিভাবে যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিল না। গোটা ব্যাপারটা যেন তার নাগালের বাইরে। বহু সৈনিক যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। বীরপুরের সেনাদের এই অবস্থা দেখে স্বর্ণাচারি ও সমরবাহুর অনুচরদের মধ্যে দারুণ আনন্দ হল। যত-জন পাহাড়ের উপরের দিকে উঠছিল, তারা প্রত্যেকে পালিয়েছে অথবা আহত হয়েছে।

গড়াতে এদিক ওদিক পড়ে যাচ্ছিল। ওদের এই অসফলতার ফলে বীরপুরের সেনাদের মনে উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল। ওরা তরবারি বের করে নিজের রাজার জয়ধ্বনি করছিল। ওদের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, "জয় বীরপুরের রাজার জয়!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরপুরের সেনারা বাঘ ও সিংহ নিয়ে যে গুহায় বনবাসীরা অপেক্ষা করে বসেছিল, সেইখানে এল। এদিকে স্বর্ণাচারি তখন ভাবছিল বনবাসীরা ঠিক সময়ে বাঘ ও সিংহকে শত্রুর উপর ছেড়ে দেবে না নিজেরাই ভয়ে পালাবে। নিজেদের রাজার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কতটা যে এগিয়ে আসবে, সাহায্য করবে

এই অবস্থা দেখে সমরবাহুর অনুচররা স্বর্ণাচারিকে বলল, "মহামন্ত্রী, আমাদের নির্দেশ দিন, বীরপুরের পলায়মান সেনাদের বল্লম দিয়ে মেরে শেষ করে দি।"

স্বর্ণাচারি তাদের এই কথায় কোন জবাব দিল না। সে হিসেব কষে দেখল বীরপুরের যে সেনাদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের সংখ্যা ওদের দশভাগের এক ভাগ হবে। বাকি নয় ভাগ নিশ্চয় আশেপাশে বন জঙ্গলে লুকিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই মুহূর্তে বাঘ বা সিংহ সমরবাহুর লোকের হাতে আর নেই।

এদিকে পাহাড়ের নিচে অদূরে বীরপুরের সেনাপতি পলায়মান সেনাদের জড় করে তারপর কি করবে না করবে বোঝাচ্ছিল। সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার পাহাড়ের অন্য প্রান্ত ঘুরে ঘুরে দেখছিল। স্বর্ণাচারি সমরবাহুর লোককে ঐ ঘোড়সওয়ারদের দেখিয়ে বলল. "দেখ, সাহস ভাল জিনিস কিন্তু যুদ্ধের সময় দুঃসাহস ভাল নয়। ঐ দেখ বীরপুরের সেনাপতি আবার উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের আক্রমণ করতে। এখন আমরা যে কয়জন আছি, আমাদের পক্ষে ওদের আক্রমণের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। শত্রু যখন সবল তখন তাকে আক্রমণ করা মূর্খতা। ওরা লড়বে ওদের মত, আমরা লড়ব আমাদের মত। এখন আমাদের শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে ওদের মোকাবিলা করতে পারব না। এখন আমাদের উচিত এখান থেকে সরে পড়া। আমাদের উট প্রস্তুত রয়েছে। বনে কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা হয়ত দুই ক্ষত্রিয় যুবক ও সমরবাহুর সাক্ষাৎ পেতে পারি।"
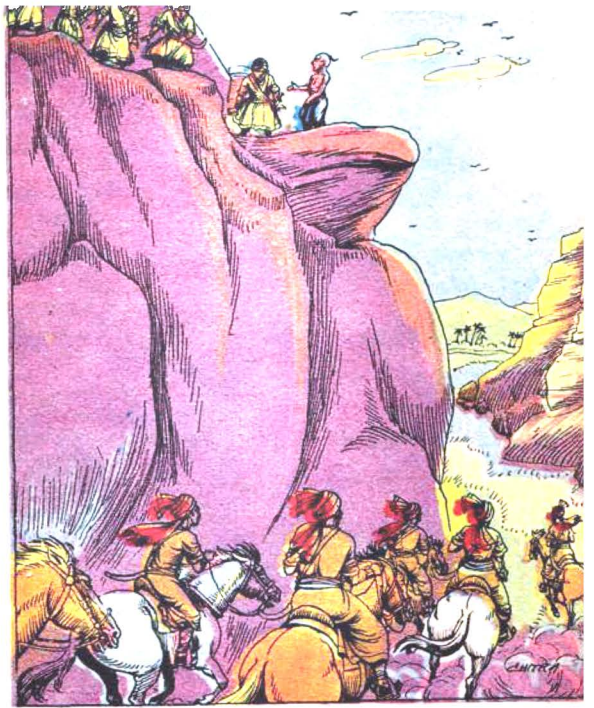
"সিংহ ও বাঘ নিয়ে যে বনবাসী সঙ্গে এসেছিল ওরা আমাদের সঙ্গে কি নেই? ওদের সাহায্য পেলে শত্রুকে পরাজিত করা সহজ হত।" সমরবাহুর একজন অনুচর বলল।

"হয়তো ওরা ভয় পেয়ে বনে পালিয়েছে।" স্বর্ণাচারি বলল।

"মহামন্ত্রী, এখন যদি আমরা পালাই তাহলে কি শত্রু আমাদের কাপুরুষ ভাববে? ..." কথাটা শেষ হতে না হতেই সমরবাহুর সেই লোকটা দেখতে পেল তার অনুচররা ছুটতে ছুটতে আসছে। ওরা এসে স্বর্ণাচারিকে বলল, "মহামন্ত্রী, শত্রু আমাদের উটগুলোর দিকে আসছিল। আমরা তখন ওদের তাড়া করতে এগিয়ে গেলাম। ওরা কিন্তু আমাদের কিছু না বলে চুপচাপ সরে পড়ল। ওদের গতিবিধি দেখে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ওরা খুব সম্ভব আমাদের ওপর আরও বড় ধরণের আক্রমণ করার জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ওরা যদি আমাদের উটগুলো নিয়ে যায়, তাহলে আমরা দুদিক থেকে বিপদে পড়ব। অতএব আর দেরি নয় চল উটের কাছে যাই।" স্বর্ণাচারি একথা বলে পাহাড় থেকে নিচে নাবতে লাগল।

স্বর্ণাচারি ও সমরবাহুর অনুচররা পাহাড় থেকে নিচে নেবে উটের উপর বসতে না বসতেই দেখা গেল চল্লিশ পঞ্চাশজন বীরপুরের ঘোড়সওয়ার তরবারি ও বল্লম উঁচিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। মুহূর্তে স্বর্ণাচারি ঠিক করে নিল যে শত্রু যখন দেখে ফেলেছে তখন আর পিছনের দিকে না পালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল প্রয়োগ করাই যুদ্ধের নীতি। আঘাত না হানলে আঘাত খেতে হবে শত্রুর কাছ থেকে। তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে স্বর্ণাচারি সমরবাহুর অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বলল, "হে উষ্ট্রবীরগণ, পাহাড়ী দুর্গের দেবীর কাছে শত্রুকে বলি দেবার জন্য তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চল।"

পরক্ষণেই রণধ্বনি তুলে বীরপুরের ঘোড়সওয়ার সেনারাও স্বর্ণাচারির দিকে দ্রুত ধাবিত হল। (চলবে)

আসল কারণ

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ঐ গাছের কাছে আগের মতই ফিরে এলেন। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলে উঠল, "রাজা, তুমি ধনী তাই তুমি হয়ত ধনের আশায় এই পরিশ্রম না করতে পার, তবু মনে রেখ ধন হল অত্যন্ত পাপপূর্ণ একটি জিনিস। ধন স্নেহ বোঝে না, ভালবাসা বোঝে না। আমার কথা আরও ভাল করে বুঝতে পারবে যদি একটি গল্প শোন। তোমার পথ হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: সাকেতপুরে এক ছিল খুব গরিব লোক। একদিন সে অন্যান্য দিনের মতই কাঠ কাটতে গেল বনে। কাঠ কেটেই সে পরিবারের খরচ চালাত। সেদিন শুনতে পেল এক কাতর আর্তনাদ।

বেতাল কথা
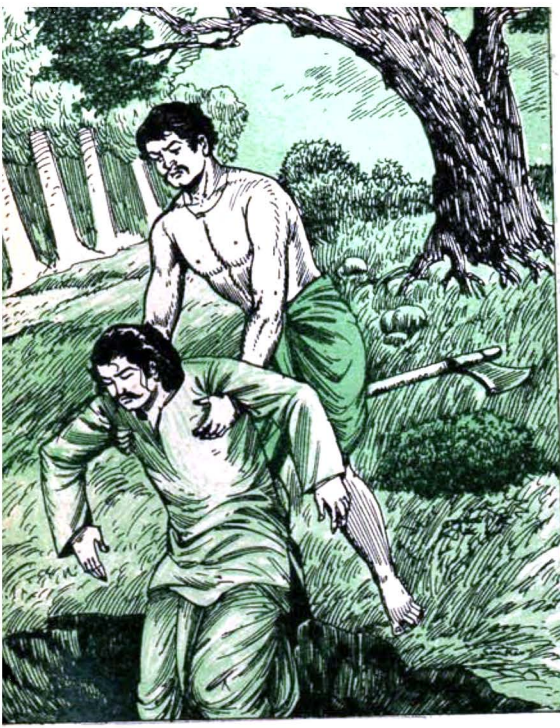
গরিব লোকটার নাম ছিল গোপ। সে তাড়াতাড়ি যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেই দিকে গেল। গিয়ে দেখে একজন গর্তে পড়ে ছটফট করছে। গোপ তাকে তুলে দেখে লোকটা পাশের গাঁয়ের লোক। নাম রামভদ্র। বিরাট ধনী।

"আমাকে ডাকাতরা লুঠ করে এনে এই গর্তে ফেলে রেখে গেছে। দুদিন ধরে আমার পেটে একমুঠো ভাত পড়েনি। আমি ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। তুমি উদ্ধার করতে এসেছ।" রামভদ্র বলল।

গোপ রামভদ্রকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই রামভদ্র সেরে উঠল। একদিন রামভদ্র গোপকে ডেকে বলল, "আমি তোমার জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। তুমি উদ্ধার না করলে আর কে উদ্ধার করত।" বলে রামভদ্র তাকে কিছু টাকা দিতে চাইল। গোপ বলল, "মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে তার জন্য আবার টাকা নেবে! এ ভাল নয়।"

দুজনের মধ্যে ভাব-ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। গোপের যখন অভাব অনটন দেখা দিত তখন সে অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার নিত। সে রামভদ্রের কাছ থেকে ধার নেবার কথা ভাবতে পারত না। কথাটা রামভদ্রের কানেও গেল যে গোপ ধার করে বেড়ায়। তার দিন কাটে না। এসব জানার ফলে রামভদ্র এমনভাবে মেলামেশা করত যেন সেও গরিব।

দুজনের বন্ধুত্ব এত গভীর এবং নিবিড় হয়ে গেল যে সারা গাঁয়ের লোকের কাছে ওদের বন্ধুত্ব প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়ে গেল।

এভাবে অনেক বছর কেটে গেল।

গোপের স্ত্রী অসুখে পড়ে গেল। সাধারণ তো দূরের কথা ভাল বৈদ্যের পক্ষেও তার অসুখ সারানো সহজ ছিল না।

"এরকম কঠিন রোগ দেবশর্মা ছাড়া অন্য কেউ সারাতে পারে না।" যারা দেখতে এসেছিল তারা বলল।

গোপ চমকে উঠল। সে তার বউয়ের বাঁচার আশা ছেড়েই দিল। কারণ দেবশর্মা

পাথরে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে কিন্তু তার মন পাথরের চেয়ে কঠিন। তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে শত শত টাকা দরকার।

একথা কানে যেতেই রামভদ্র নিজেই দেবশর্মাকে ডেকে আনল। দেবশর্মা এসে গোপের স্ত্রীকে পরীক্ষা করে দেখে বলল, "এ রোগ সারানো যাবে। তবে তিরিশ দিন ওষুধ খেতে হবে। প্রত্যেক দিনের জন্য খরচ পড়বে পঞ্চাশ টাকা।"

"ঠিক আছে আপনি চিকিৎসা শুরু করুন।" রামভদ্র বৈদ্যকে বলল।

টানা একমাস গোপের স্ত্রীর চিকিৎসা চলল। গোপের স্ত্রী দেবশর্মার কথামত ঠিক এক মাসেই সেরে উঠল। রামভদ্র দেবশর্মাকে পনের শো টাকা দিয়ে দিল। গোপের মনে আনন্দ হল। যাই হোক তার বউ অত বড় রোগ থেকে সেরে উঠেছে। কিন্তু তার মনে দুঃখও হল। ভাবল বন্ধুত্বের মধ্যে টাকার আদান প্রদান উচিত নয়।

এই ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গোপ দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে কোন ভাবে সে রামভদ্রের টাকা ফেরত দেবেই। কিন্তু যত দিন যায় ততই অবস্থা খারাপ হতে থাকে। গোপ বুঝতে পারে যে সে যত সহজে টাকা শোধ দেবার কথা ভেবেছিল তার পক্ষে কাজটা তত সহজ হবে না। পরিশ্রম বাড়িয়ে খাওয়া কমিয়েও তার টাকা জমানো সম্ভব হচ্ছিল না। পনের
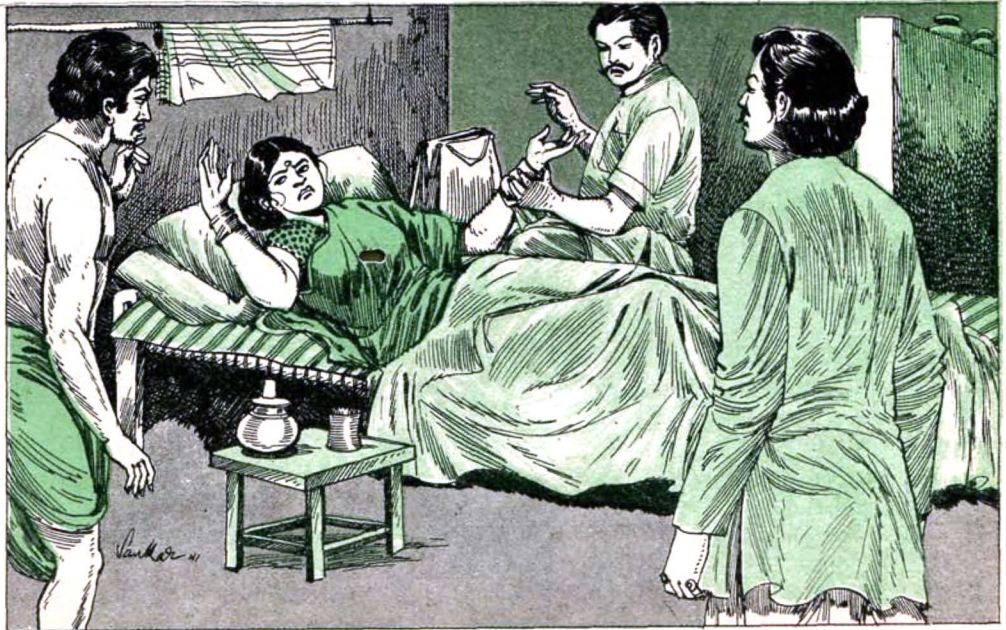
শো তো দূরের কথা পনের টাকাও সে জমাতে পারল না।

টাকা জমানোর জন্য স্বামীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে গোপের স্ত্রী বলত, "এতদিন তুমি বলতে রামভদ্র তোমার বন্ধু। বন্ধুকে সাহায্য করে কি কেউ ফেরত নেয়? ওর মত ধনী লোকের পক্ষে পনের শো টাকা তো কিছুই নয়। বিপদে বন্ধু খরচ করবে না। তোমার বন্ধু কি জানে না যে তুমি যতই পরিশ্রম কর না কেন কোন ক্রমেই তোমার পক্ষে অত টাকা জমানো সম্ভব নয়?"

গোপের স্ত্রী আশেপাশের মহিলাদের এই কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলত।

প্রত্যেকদিন এক কথা শুনতে শুনতে গোপেরও মনে হল তার স্ত্রীর কথাই ঠিক। যত সে ঐ টাকার কথা ভাবে ততই রামভদ্রের বিরুদ্ধে তার মনে প্রচ্ছন্ন রাগ যেন জমতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল অতীতের কথা। তাকে সে গর্ত থেকে তুলে বাঁচিয়েছে। তার জন্য সে কি পেল। শুধু দুটো মিষ্টি কথা। রামভদ্রের কথা ভাবলেই গোপের মাথা গরম হয়ে যেত।

আস্তে আস্তে সে রামভদ্রের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কমিয়ে দিল। তাকে দেখলেই তার মনে পড়ত সেই পনের শো টাকার কথা। আর টাকার কথা মনে পড়লেই রামভদ্রকে যেন শত্রুর মত লাগত।

এরকম অবস্থায় গোপের স্ত্রী যে কথা প্রতিবেশিনীদের কাছে বলে বেড়াত সে কথা ঘুরতে ঘুরতে রামভদ্রের কানেও গেল। সবাই তো অন্যের মঙ্গল কামনা করে না। তাই যারা গোপ ও রামভদ্রের বন্ধুত্ব ভাল চোখে দেখত না তারা এই অবস্থার সুযোগ নিল। কয়েকজন রামভদ্রকে বলল, "আপনার ধার শোধ করার জন্য গোপ প্রাণপাত পরিশ্রম করছে আর আপনি দেখেও না দেখার ভান করছেন। এ আপনার উচিত হচ্ছে না।"

রামভদ্র লোকের মুখ থেকে এই সব কথা শুনে ভাবল সে তো গোপকে কোন

দিন টাকা শোধ করার কথা বলেনি। তবু কেন লোকের মুখে মুখে একথা ঘুরছে। গোপ নিজেই তো শোধ করে দেবে বলেছে। সে তাতে কোন কথা বলেনি। কারণ শোধ দিতে হবে না বললে গোপ হয়ত মনে দুঃখ পেত। অন্যদিক থেকে গোপ যদি বলত, "আমি তোমার টাকা কোন দিনই বোধহয় শোধ দিতে পারব না।" তাহলে কি আমি তার কাছে হাত পেতে চাইতাম। বরং আমার কত ভাল লাগত। সামনা সামনি কিছুই বলল না অথচ পিছনে এইসব কথা প্রচার হচ্ছে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে নিজেদের অজান্তেই কবে যে একে অন্যের শত্রু হয়ে গেল তারা নিজেরাই টের পেল না।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, গোপ ও রামভদ্রের মধ্যকার অমন নিবিড় বন্ধুত্বে চিড় ধরল কেন? গোপের দারিদ্রই কি এর জন্য দায়ী? নাকি রামভদ্রের ব্যস্ততা? অথবা রামভদ্রের টাকা পয়সাই দায়ী? রাজা আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তুমি জবাব না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

"ওদের বন্ধুত্বে চিড় ধরার মূলে ছিল শুধু টাকা। ওদের দুজনেই একথা ভালভাবেই জানত যে টাকার আদান-প্রদানের ফলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। ওরা সব সময় টাকা পয়সার ব্যাপারে সতর্ক থাকত। টাকার ব্যাপারে ওদের ঐ ধারণার ফলেই বন্ধুত্বে ফাটল ধরতে ধরতে পরিণতি অত খারাপ হয়ে গেল। টাকার ব্যাপারে অত গুরুত্ব না দিয়ে ওরা বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করার চেষ্টা করলে ওদের বন্ধুত্ব অটুট থাকত।"

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। পরক্ষণেই গিয়ে উঠল সেই গাছে।

(কল্পিত)
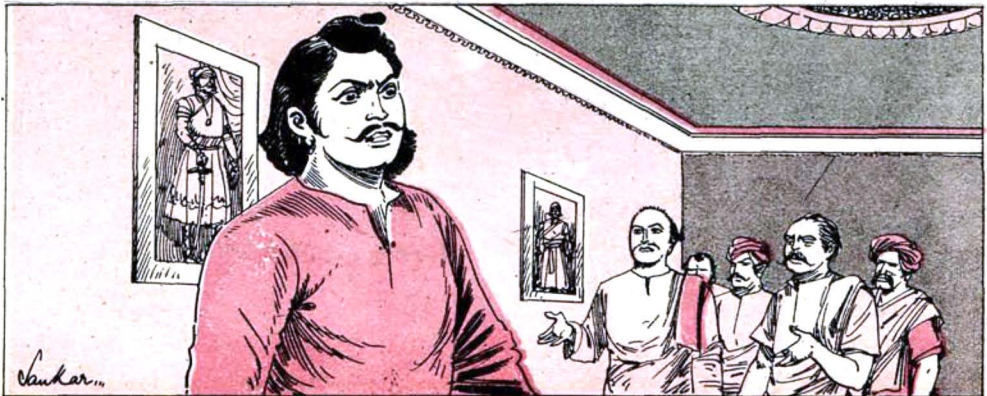
রাজার মেজাজ

কোন এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আশেপাশের লোক যখনই বিপদে পড়ত তাঁর কাছে এসে মুক্তি পাবার উপায় জেনে যেত।

পরের বিপদ যে ব্রাহ্মণ মুক্ত করার ব্যবস্থা করতেন তাঁর নিজের অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ থাকত। দিন এনে দিন খাওয়াই ছিল তাঁর ভাগ্যলিপি। এহেন ব্রাহ্মণকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এক নামকরা লোক রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আপনার রাজত্বে একজন পণ্ডিত না খেতে পেয়ে দিনের পর দিন কষ্ট পাচ্ছেন এ কিন্তু আপনার সুনামের পক্ষে ক্ষতিকারক।"

রাজা সেই লোকটার কথায় বিশ্বাস করে কয়েকটি মুদ্রা পুরে একটি থলি সেপাইদের হাতে দিয়ে ঐ ব্রাহ্মণের কাছে পাঠিয়ে দিল। সেপাইরা ঐ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলল তাকে, "পণ্ডিত মশাই, আপনার সম্পর্কে রাজা অনেক ভাল কথা শুনে আপনাকে দেবার জন্য রাজা এই থলি ভর্তি মুদ্রা পাঠিয়েছেন।"

"আমি এমন কিছু রাজার জন্য করিনি যে রাজা আমার জন্য উপহার পাঠাবেন। উপহার নিতে আমি অক্ষম।" পণ্ডিত সেপাইদের বললেন।

ঘরে ঢুকতেই পণ্ডিতের স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "একি করলে। ফেরত দিলে!"

"রাজা আজ কারো মুখে ভাল কথা শুনে উপহার পাঠিয়েছেন; কোন দিন খারাপ কথা শুনে মাথা কাটতে লোক পাঠাবেন।" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বললেন।
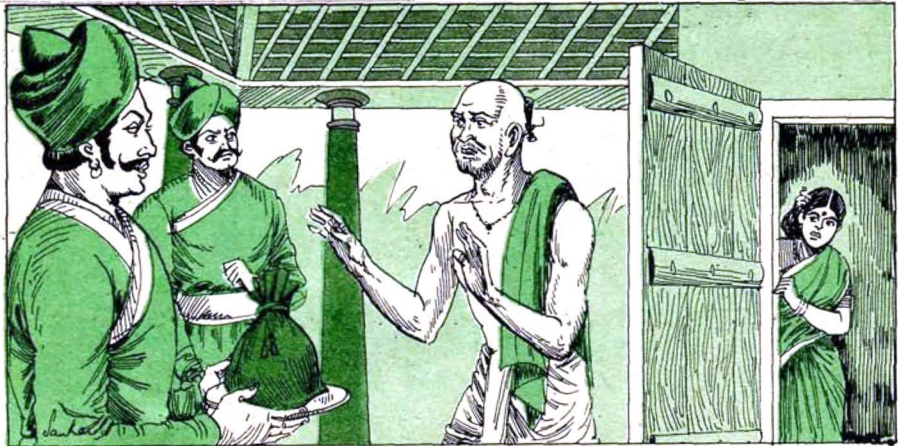
ধূর্ত জাদুকর

এক গ্রামে দুই ভাই ছিল। তারা ছিল খুব গরিব।

বড় ভাই ছিল খুব পরিশ্রমী কিন্তু বুদ্ধিতে সে ছিল খাট। ছোট ভাই সব কাজেই ছিল পটু। যেমন চালাক তেমনি সে চটপটে।

কাজের সন্ধানে ওরা গ্রামান্তরে গেল। তারপর যেতে যেতে পৌঁছে গেল একেবারে রাজধানীতে। বড় ভাই ঠিক করল পরের দিন রাজার কাছে গিয়ে কাজ চাইবে।

"সন্ধ্যের মধ্যে ঘুরে এস।" ছোট ভাই বড় ভাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলল।

বড় ভাই রাজমহলের কাছে পৌঁছে দেখে রাজা উদ্যানে পায়চারি করছেন। বড় ভাইয়ের চাউনি আর হাঁটা চলা দেখে রাজা বললেন, "কে তুমি? অমন করে এখানে কি দেখছ?"

বড় ভাই হাত জোড় করে বলল, "মহারাজ, আমি আর আমার ছোট ভাই অনাথ। কাজের সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি। দয়া করে আমাদের কোন কাজ দিলে আপনার নাম করে আমরা সারা জীবন কাটাব।"

"কাজ তোমাকে দিতে পারি তবে দায়িত্বের সঙ্গে তুমি তোমার কাজ করতে পারবে তো?" রাজা বললেন।

"অবশ্যই করব মহারাজ।" জোর দিয়ে বলল বড় ভাই।

রাজা তাকে রাজমহলের মন্দিরে নিয়ে গেলেন। এক সুন্দর সাদা ছাগলছানা তাকে দেখিয়ে বললেন, "এটাকে নিয়ে যাবে। সারাদিন চরাবে। সূর্যাস্তের আগে এটাকে এনে আমায় ফেরত দেবে। তবে একটা কথা মনে রেখ, পূব দিকে যে টিলা

বোম্মানা বিশ্বনাথম

আছে তা পেরোবে না। পেরোলে কঠিন শাস্তি দেব।”

রাজার নির্দেশে রাজী হল বড় ভাই খাবার পোঁটলা আর ছাগলছানা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বনে যেতেই ছাগলছানার মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। কত রকমের ভঙ্গী করে যে সেটা ছোটাছুটি করতে লাগল তার ঠিক নেই।

ছাগলছানা ছুটতে থাকে আর পিছনে পিছনে ছোটে বড় ভাই। এভাবে অনেক দূরে চলে যায় তারা।

দুপুরে একটা ঘাটে বড় ভাই যা খেল ছাগলছানাও তাই খেল। তারপর তারা গেল পূবের ঐ টিলায়। টিলায় ছিল একটি গাছ। গাছে ফল ছিল ভর্তি।

রাজার সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে বড় ভাই টিলার উপরে উঠে নানা রকমের ফল খেল। ফলের রসে তার হাত ভরে গিয়েছিল। সে আশেপাশে জল আছে কিনা খোঁজ করতে লাগল। হাত না ধুলেই নয়।

চারদিক তাকাতে তাকাতে অদূরে বড় ভাই টিলাব ওপারে একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেল। সে ঐ ছাগলছানাকে কোলে তুলে নিয়ে ঐ কুঁড়ে ঘরের দিকে জলের খোঁজে এগোতে লাগল। সে যত এগোতে থাকে ঐ ছাগলছানা তত বেশি ছটফট করে আর তারস্বরে ডাকতে থাকে। কিন্তু বড় ভাইয়ের বুদ্ধি কম থাকায় এসবের কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে ঐ কুটিরের দিকে এগোতে লাগল।

ঐ কুটিরের কাছে এক ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক বসেছিল। লোকটার মাথা ন্যাড়া। চোখগুলো জ্বল জ্বল করছিল। চাপ দাড়ি। তার পাশে ছিল ছাগলের কাঁচা মাংস। মাংস পোড়ানোর লোহার শলাকা। সে উনান ধরানোর ব্যবস্থা করছিল। সে বড় ভাইকে দেখে বলল, “আরে এই ছোকরা, এসোতো এদিকে। এদিকে এসে উনান ধরিয়ে যাও তো?”

“সন্ধ্যের আগেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমি একটু জল খেতে এদিকে এসেছি। আমাকে একটু জল দেবেন।” বড় ভাই কিছুটা যেন ভয় পেয়ে বলল। ছাগলছানা আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

লোকটা উঠে ছাগলছানার কান মলে দিয়ে বলল, “এই, এখনও তোর দেমাগ কমেনি দেখছি।”

তারপর সে বড় ভাইয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, “এই ছাগলছানাটা খুব দেমাগী। তুমি একটা কাজ কর। এটাকে ঘরে পুরে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে উনান ধরিয়ে যাও। তুমি আমার উনান ধরাও, আমি তোমার জন্য জল এনে দিচ্ছি।” একথা বলে লোকটা থপ্ থপ্ করে পা ফেলতে ফেলতে জল আনতে চলে গেল।

এদিকে বড় ভাই নিরুপায় হয়ে ছাগল-ছানাটাকে ঘরে বন্ধ করে রেখে উনান ধরানোর চেষ্টা করতে লাগল। যতই চেষ্টা করুক উনান অত সহজে ধরতে চায় না।

শেষে অনেক পরিশ্রম করার পর উনান যখন ধরাতে পারল তখন চার দিক কাল অন্ধকারে ছেয়ে গেল। বড় ভাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই সেই ভয়ঙ্কর আকৃতির লোকটা জল এনে দিল।

জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বড় ভাই ঘরের দরজা খুলে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সেখানে ছাগলছানা নেই। আছে সেখানে এক অদ্ভুত আকৃতির যুবতী। তাকে দেখতে পেয়েই বড় ভাই ভয়ে চিৎকার করে উঠল, “বাবারে, ভূত! ভূত!” বলে সেখান থেকে সে ছুটে পালাল।

রাত্রে বড় ভাই রাজার কাছে গিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে বলল, “মহারাজ, আপনি আমাকে যে ছাগলছানাটাকে চরানোর জন্য দিয়েছেন, সেটা সাধারণ ছাগলছানা নয়। আসলে সেটা একটা ভূত।” তারপর সে যা যা ঘটেছিল সব বিস্তারিতভাবে রাজার কাছে বলল।

বড় ভাইয়ের মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে রেগে গিয়ে রাজা গর্জে উঠে বললেন, "এই কে আছিস, এই পাজি বদমাইশটাকে কয়েদখানায় পুরে দে।"

রাজার নির্দেশ পেয়ে সেপাইরা বড় ভাইকে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় পুরে দিল।

এদিকে সন্ধ্যের পর থেকেই ছোট ভাই দাদার খবর না পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে সোজা ছুটে গেল রাজার কাছে। রাজা যখন জানতে পারলেন যে আগন্তুক ঐ বদমাইশের ছোট ভাই তখন তাঁর আরও রাগ হল।
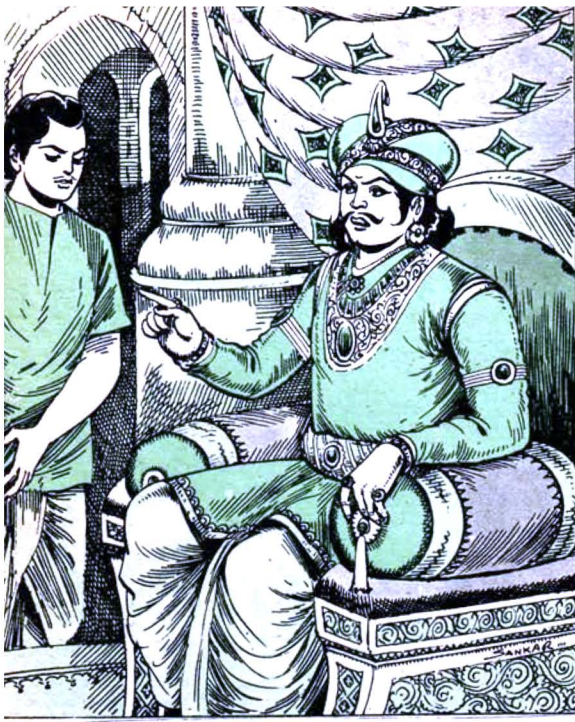
কিন্তু ছোট ভাই এতে বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মাথা নত করে রাজাকে সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাতে অনুরোধ করল।

সব কথা রাজার কাছ থেকে শুনে সবিনয়ে ছোট ভাই বলল, "মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনার পিছনে কোন রহস্য আছে। আপনি দয়া করে আমাকে বিস্তারিত জানালে আমি আপনার ছাগলছানা হয়ত এনে দিতে পারব। আর আমার দাদাকেও কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারব।"

ঐ যুবকের কথা শুনে রাজার মনে হল ওর বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে। রাজা ঐ যুবককে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে ছাগল-ছানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল।

রাজার অধিক বয়সে একটি মেয়ে হয়েছিল। রাজার কোন ছেলে না থাকায় রাজা তাঁর মেয়েকেই ছেলের মত করে মানুষ করতে লাগলেন। তাঁকে সঙ্গে করে নানা জায়গায় নিয়ে যেতেন। এমন কি শিকারে যাওয়ার সময়েও রাজা মেয়েকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

একবার শিকার করতে করতে রাজা ও রাজকুমারী অনুচর ছাড়াই শিবির থেকে অনেক দূর চলে গেলেন। পূব দিকের টিলা পেরিয়ে তাঁরা সামনে একটি কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলেন।

কুঁড়ে ঘরের সামনে এক বিরাট বিকৃত আকারের লোক বসেছিল। লোকটা লোহার

শলাকা দিয়ে ছাগলের মাংস অল্প একটু পুড়িয়ে খাচ্ছিল। ওর ঐভাবে প্রায় কাঁচা মাংস খাওয়া দেখে রাজকুমারীর বমি হল।

"এখানে একটু জল পাওয়া যাবে?" রাজা ঐ লোকটাকে বললেন।

লোকটা কোন জবাব দেওয়ার আগেই রাজা ও তাঁর কন্যার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর ভেতর থেকে জল এনে রাজাকে বলল, "এই মেয়েটাতো খুব সুন্দর। তোমার মেয়ে বুঝি? একে আমাকে দিয়ে দাও না?"

"আধ পোড়া মাংস খেকো রাক্ষস কোথাকার। আমাকে চাইছ? তোমার সাহস তো কম নয়?" রাজকুমারী রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

একথা শুনে ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার চোখ লাল হয়ে গেল!

তৎক্ষণাৎ সে ঐ মাংসে ঢোকানো শলাকা রাজকুমারীর মাথায় ছুঁইয়ে বলল, "তুমি ছাগলের মাংস ঘৃণা কর, এখন থেকে তুমি সারাদিন ছাগল হয়ে থাকবে। আর সারা-রাত আমার চেয়েও বিকৃত আকারের যুবতী হয়ে থাকবে।"

রাজকুমারী সেই মুহূর্তে ছাগলছানা হয়ে গেল। তারপর থেকে সে দিনে ছাগলছানা আর রাত্রে এক ভয়ঙ্কর আকৃতির নারীর রূপ পেল। রাত্রে তাকে যেন কেউ

দেখতে না পায় রাজা সেজন্য সব সময় সতর্ক থাকতেন। এমনিতে রাজকুমারীর বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর আকৃতির লোকটা যা করলো তাতে বিয়ের আর কোন প্রশ্নই উঠেনি। পরে জানা গেল লোকটার সমস্ত শক্তি রয়েছে তার দাড়ি ও শলাকায়।

ছোট ভাই রাজার কাছ থেকে এই সমস্ত ঘটনা শুনে রাজাকে বলল, "আজ রাত্রে রাজকুমারীর কোন ক্ষতি হবে না। সকাল হওয়ার আগে তাকে যদি উদ্ধার করা না যায় তাহলে কিন্তু রাজকুমারীকে বাঁচানো যাবে না। আপনি এক্ষুণি দয়া করে আমাকে একটা ভাল ওজনদার ছাগল

আর কিছুটা গুগগুল দিন। আমি আপনার মেয়েকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তাই করলেন।

ছোট ভাই গুগগুল আর ছাগল নিয়ে সেই রাত্রেই পূব দিকের টিলা পেরিয়ে ঐ কুঁড়ে ঘরের কাছে গেল। তখন সেই ভয়ঙ্কর লোকটা আরামে বসে বসে পোড়া মাংস আর মদ খাচ্ছিল।

ছোট ভাই অনেক দূর থেকে আপনজনকে বলার মত বলল, "মামা কি পোড়া মাংস খাচ্ছ? দেখ তোমার জন্য কতবড় একটা ছাগল এনেছি।"

"তবে আর দেরি কেন নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। এই মাংসটা ঠিক জমছে না। মাংসে স্বাদ নেই।" ভয়ঙ্কর লোকটা বলল।

ছাগলটাকে কোল থেকে নিচে নাবিয়ে ছোট ভাই বলল, "স্বাদ হবে কোত্থেকে। মাংস তুমি ভাল করে পোড়াতেই পার না। দেখ আমি তোমাকে পুড়িয়ে খাওয়াচ্ছি।" একথা বলে ছোট ভাই তার সামনেই মাংস পোড়াতে লাগল।

"ওরে ভাগ্নে গন্ধ তো বেশ ভালই লাগছে।" সে বলল।

ছোট ভাই বলল, "অত দূরে থাকলে কি ভাল গন্ধ পাবে? আরও উনানের কাছে এস আরও ভাল গন্ধ পাবে।"

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা উনানের কাছে এসে শলাকা পাশে রেখে চোখ বুজে গন্ধ শুকতে লাগল। মুহূর্তে ছোট ভাই উনানে গুগগুল ঢেলে দিল দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনে লোকটার দাড়ি পুড়ে যেতেই ছোট ভাই শলাকা তুলে তার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "ছাগল হয়ে যাও।" তক্ষুণি সে ছাগল হয়ে বনে ঢুকে গেল। রাজকুমারী নিজের আসল রূপ ফিরে পেয়ে ছোট ভাইয়ের সাথে প্রাসাদে এল। রাজা পরে বড় ভাইকে মুক্তি দিল এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঐ রাজকুমারীর বিয়ে দিল।
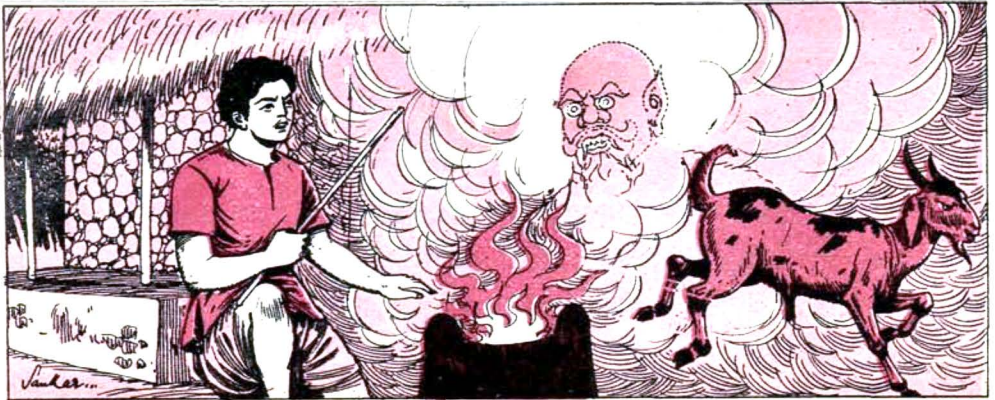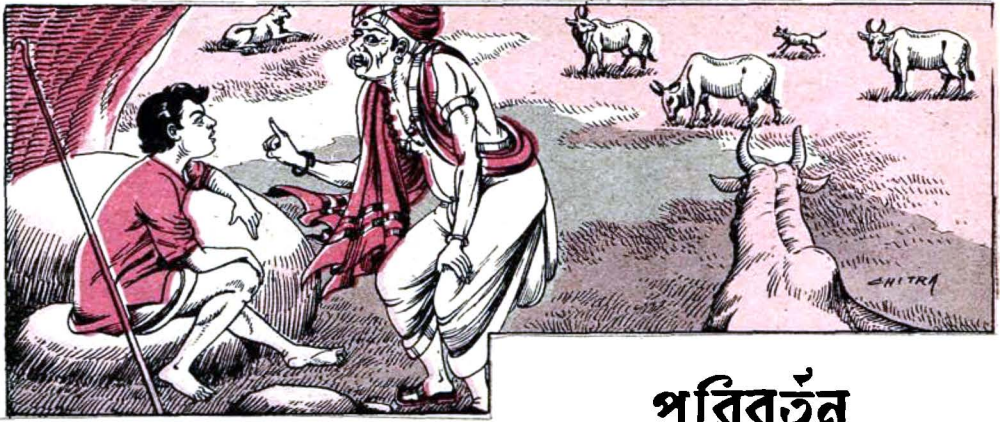
পরিবর্তন

কোন এক দেশে রঙ্গনাথ ও রাধা নামে এক দম্পতি ছিল। ছোটখাট ব্যাপারেও তারা ঝগড়া করত। ওদের ঝগড়ার কারণ শুনে পাড়ার লোক মাঝে মাঝে হেসে ফেলত। প্রায় প্রতিবেশীরা এসে তাদের বোঝাত। কিন্তু পরক্ষণেই তারা আবার ঝগড়া শুরু করে দিত।

অনেক বছর পরে ওদের এক পুত্র সন্তান হল। নাম রাখল রাম। মা বাবা দুজনেই রামকে প্রাণাধিক ভালবাসত। তাই বলে ওদের ঝগড়া যে কমে গিয়েছিল তা নয়। ছেলে যত বড় হতে লাগল তার কাছে মা বাবার ঝগড়া ততই খারাপ লাগতে লাগল। জ্ঞান হওয়ার পর সেও বুঝতে লাগল যে আশেপাশের লোক তাদের এই ঝগড়া ভালবাসছে না। তাদের উপহাস করছে।

রামের যখন বার বছর বয়স হল তখন তার কাছে এই ঝগড়ার ব্যাপারটা বিরাট সমস্যার মত ঠেকল। সে গরু-বাছুর চরাতে মাঠে গিয়েও বাবা মার ব্যাপারেই ভাবতে বসত।

একদিন এক ওঝা ঐ পথে যেতে যেতে রামকে চিন্তিত দেখে বলল, "কিরে খোকা, কি ভাবছিস এত?"

রাম তার বাবা মার ঝগড়ার ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে বলল, "যতদিন আমার বাবা মা এভাবে ঝগড়া করতে থাকবে ততদিন আমার দুশ্চিন্তা দূর হবে না।"

"বাবা এসব নিয়ে তুমি অত ভেব না। আমি যা বলব তাই করবে। মনে রেখ ওদের বদলানোর ভার তোমার উপর।" বলে ওঝা রামের কানে কি যেন বলল।

সেদিন সন্ধ্যায় গরু নিয়ে বাড়ি ফিরে রাম তার মাকে বলল, "মা, আমি তোমাকে

অনুরাধা দেবী

সকালে বলেছি না জামাটা কেচে শুকোতে দিতে। ভুলে গেলে ? আসলে তোমার যে একটা ছেলে আছে সে কথাই হয়ত তোমার মনে থাকে না।” ছেলের কথা বলার ঢং দেখে রাধা অবাক হয়ে গেল।

একটা কথা ভেবে রাধা অবাক হয়ে গেল। ছেলে যে তাকে জামা কাচার কথা বলেছে তা তার মনে পড়ছে না। ছেলে তাকে বলেনি বলেই তার ধারণা। তাহলে কি ছেলে তার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলল। কোন দিন তো ছেলে মিথ্যা কথা বলেনি। রামের মধ্যে এই পরিবর্তন যে কেন হল সেকথা ভাবতে ভাবতে রাধা চাল ডাল কিনতে দোকানে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রঙ্গনাথ ক্ষেত থেকে ফিরে এসে রামকে মাথা গুঁজে বসে থাকতে দেখে বলল, “কিরে কি হয়েছে ? মাথা গুঁজে বসে আছিস কেন ?”

“শরীর ঠিক আছে। চারজনের কাছে যেতে লজ্জা করে।” রাম জবাবে বলল।

“লজ্জার কি আছে ? রঙ্গনাথ বলল।

“আমার ভাল জামা কাপড় নেই। পায়ে ভাল জুতো নেই।” রাম বলল।

রামের কথা শুনে রঙ্গনাথ থ বনে গেল। যে ছেলে কোন দিন একটি জিনিস চায় নি। মুখ তুলে একটি কথাও বলে নি।

ইতিমধ্যে রাধা দোকান থেকে ফিরল। বাপ আর ছেলের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল তাও তার কানে গেল। রাধা বুঝল ছেলে আজ বাপের উপরেও চটেছে। সেদিন রাত্রে খেতে বসেও রাম বাবা মার উপর খুব চোটপাট দেখাল। ওঝার পরামর্শ মত প্রত্যেকটি কাজ রাম করে যেত। এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। বাবা মা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ছেলে একই ভাবে তাদের উপর মেজাজ দেখাচ্ছে। শেষে রাধা একদিন স্বামীকে গোপনে ডেকে বলল, “মনে হচ্ছে রামের উপর কোন কিছু ভর করেছে। ওতো এরকম কখনও ছিল না। ওঝাকে ডেকে একবার ঝাড়িয়ে নিলে ভাল হত।”

"ওঝা দিয়ে কিছু হবে না। ওষুধপত্তর দিয়ে সারাতে হবে।" রঙ্গনাথ বলল।

"এসব অসুখের আবার ওষুধ কে দেবে! ওঝা একবার ঝেড়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাধা জোর দিয়ে বলল।

"ওঝা পারবে না। ওষুধ ছাড়া ওর রোগ সারবে না।" রঙ্গনাথ বলল।

এভাবে বাবা মা অনেকক্ষণ কথা কাটা-কাটি করে ঝগড়া করতে লাগল। ওদের এই অবস্থা দেখে রাম বলল, "আমি বাড়ির কাছের ওঝার কাছে যেতে পারি।"

ছেলে ওঝার কাছে যেতে আগ্রহী দেখে বাবা মা দুজনেই খুশী হল। তৎ-ক্ষণাৎ ওরা ছেলেকে নিয়ে ওঝার কাছে গেল। ওঝা ওদের কথা শুনে বলল, "তোমাদের ছেলের অসুখ সারানো যাবে। আমি তোমাদের আলাদা আলাদা প্রশ্ন করব। আগে তোমরা সঠিক জবাব দাও। তারপর ঝেড়ে ঠিক করে দেব।"

তারপর ওঝা রঙ্গনাথকে কাছে ডেকে গোপনে বলল, "রামনাথ কি তোমার ছেলে?" ওঝার মুখ থেকে এই প্রশ্ন শুনে রঙ্গনাথ অস্বস্তি বোধ করে বলল, "রাম আমারই ছেলে।"

তারপর ওঝা রঙ্গনাথকে যেতে বলে রাধাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "রাম কি তোমার ছেলে?"
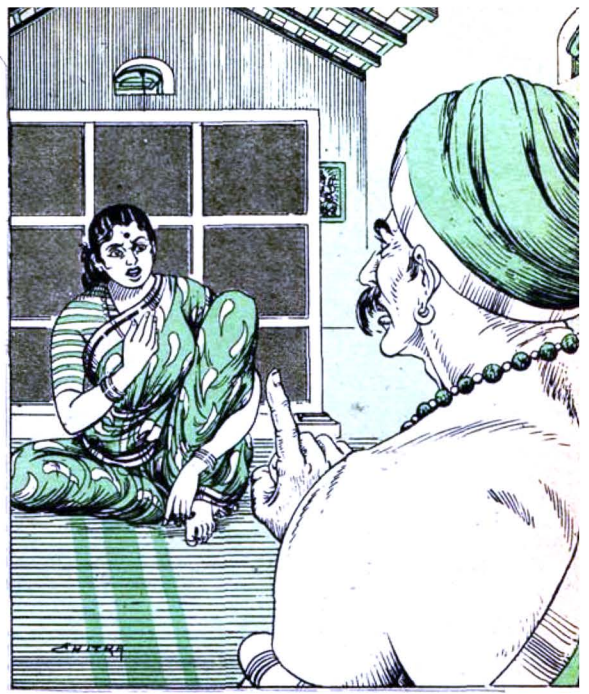
এই প্রশ্নের জবাবে রাধাও একইভাবে বলল, "হ্যাঁ। রাম আমারই ছেলে।"

পরক্ষণে দুজনকে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ওঝা বলল, "তোমরা দুজনে যে জবাব দিয়েছ তা ঠিক নয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ভেবে চিন্তে সঠিক জবাব দিয়ে যাও।"

এক সপ্তাহ পরে রঙ্গনাথ ও রাধা ওঝার কাছে এল। ওঝা আগের মতই ওদের দুজনকে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করল।

এবারে রঙ্গনাথ অনেক ভেবে বুদ্ধির পরিচয় দেবার মত বলল, "রাম আমার স্ত্রীর পুত্র।

কিন্তু রাধা আগের মতই বলল, "রাম আমারই ছেলে।"

এবারেও ওঝা দুজনকে এক জায়গায় ডেকে বলল, "তোমাদের দুজনের জবাব এবারেও ঠিক হয়নি। বাড়ি ফিরে যাও। আবার এক সপ্তা পরে ভেবে চিন্তে আমার কাছে এসো।"

এদিকে রামের পাগলামী দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। বাবা মা সব সময় ছেলের মেজাজ দেখে ভয় পেত। দিন রাত তার কথা ভাবত।

রঙ্গনাথ ও রাধা ওঝার প্রশ্ন নিয়ে দুজনে এক জায়গায় বসে কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করল।

এক সপ্তাহ পরে রঙ্গনাথ ও রাধা দুজনে ওঝার কাছে গিয়ে বলল, "আমরা দুজনে বসে ভেবে চিন্তে এসেছি।"

ওঝা আগের মতই দুজনকে আলাদা আলাদা ডেকে প্রশ্ন করল। তার প্রশ্নের জবাবে দুজনেই একই জবাব দিল, "রাম আমাদের ছেলে।"

ওঝা খুব আনন্দিত হয়ে বলল, "এবারে তোমাদের দুজনের জবাব ঠিক হয়েছে। এতদিনে তোমাদের ভূত ছেড়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীতে সব সময় ঝগড়া করে কাটালে সারা জীবন তাদের খারাপই কাটে। রামের কিছুই হয়নি। তোমাদের দুজনের ঝগড়ার ফলেই রামের ঐ অবস্থা হয়েছিল। রাম তোমাদের সোনার টুকরো ছেলে। তোমরা ঝগড়া করতে বলে রাম মনে শান্তি পেত না। তার অশান্তির, আর মেজাজ গরম করার মূলে ছিল তোমাদের দুজনের ঝগড়া।"

এর ফলে রঙ্গনাথ ও রাধার ভাল শিক্ষা হয়েছিল। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল। তারপর থেকে দুজনে আলাপ আলোচনা করে সব কাজ করত। এই ঘটনার পর থেকে কথায় কথায় বাবা মা ঝগড়া করছে না দেখে রামের খুব ভাল লাগত। তার আর কোন চিন্তা ছিল না।
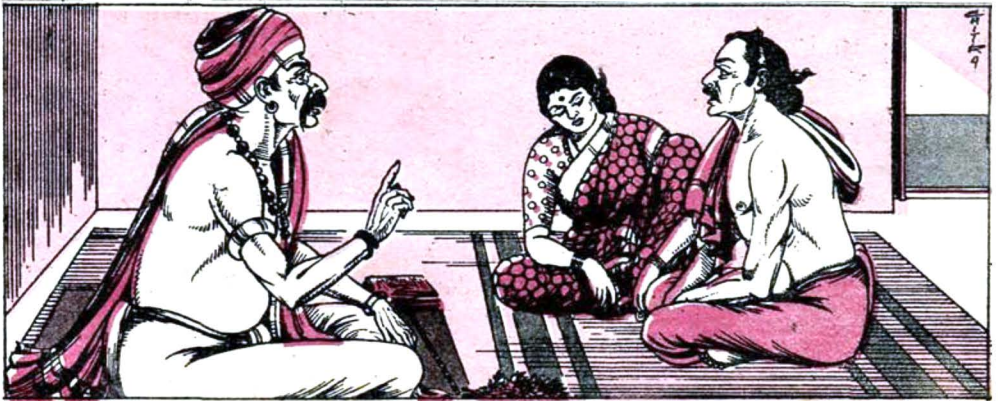
সত্যকামের জাদু

হীরাগড় দেশে হরবর্মা নামে এক ব্যবসাদার ছিল। লোকটা ছিল খুব সৎ ও ধর্মাত্মা। সব সময় সে সামান্য লাভে জিনিস বিক্রী করত। ভাল জিনিসের সঙ্গে কখনও সে খারাপ জিনিস মেশাত না। কোন গোপন পথেও কোন জিনিস আদান প্রদান করত না। অল্প অল্প লাভ করলেও তার অনেক টাকা জমে যেত। কারণ তার কাছে খদ্দেরের ভীড় সব সময় লেগে থাকত। খাঁটি জিনিস অল্প দামে কে না কিনতে চায়।

যথা সময়ে হরবর্মা বৃদ্ধ হল, অসুখে পড়ল ও মারা গেল। তার মৃত্যুর পর তার এক-মাত্র ছেলে শঙ্কাবর্মা সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মালিক হল। চরিত্রের দিক থেকে শঙ্কা-বর্মা ছিল বাপের বিপরীত। যেমন স্বার্থপর তেমন লোভী। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত ছিল। আচার আচরণে অত্যন্ত ভদ্র। মুখে মিষ্টি কথা। মুখের কথায় কেউ বুঝতে পারত না তার আসল রূপ।

তার বউ ছিল পাশের দেশের ব্যবসায়ীর মেয়ে। নাম তার রঙ্গীলা। যেমন বর তেমনি কনে। কূট বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে সে শঙ্কাবর্মাকেও বুদ্ধি দিত।

হীরাগড় দেশের লোক সুখেই ছিল। কারণ সে দেশের মাটি ছিল খুব উর্বর। এর ফলে সে দেশে ধান চালের উৎপাদন বেশ ভালই হত। লোকের অভাব অনটন বলতে তেমন কিছু ছিল না।

সে বছর ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ভালই হয়েছিল। বাইরের ব্যবসাদাররা এসে বেশী দাম দিয়ে ধান উঠতে না উঠতেই কিনে নিল। ভাল দাম পাওয়ার লোভে পড়ে লোকে উজাড় করে ফসল বিক্রী করে

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

দিল। বাইরের ব্যবসাদাররা যেমন রাতা-রাতি এল তেমনি চলেও গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই হীরাগড়ের সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। সারা দেশে ধানের একটি কণাও অবশিষ্ট ছিল না। দেশবাসীর জন্য রাজা তার ভাণ্ডারে মজুত সমস্ত ধান দেশের লোকের মধ্যে বণ্টন করে দিল। কিন্তু তবুও দেশ থেকে খাদ্যের অভাব মিটল না। রাজা চিন্তার মধ্যে পড়লেন।

ফলে সারা দেশে আকালের করাল ছায়া নেমে এল। চোখের সামনে মানুষ না খেতে পেয়ে মরতে লাগল। রাজা অসহায়। দুঃখ প্রকাশ ছাড়া তার যেন আর কিছুই করার রইল না। যাদের পয়সা আছে তারা জিনিস জোগাড় করার জন্য অনেক টাকা পয়সা খরচ করতে রাজী ছিল। কিন্তু সারা দেশের খাদ্য রাতারাতি কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তা তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। তখন যাদের টাকা পয়সা ছিল না তারা যেমন খাবার পেল না যাদের ছিল তারাও পেল না।

খাদ্যের অভাবের ফলে নানা ধরণের মারাত্মক রোগ দেখা দিতে লাগল। শত শত মানুষ খেতে না পেয়ে মারা যেতে লাগল।

সব খবর যে রাজার কাছে যেত তা নয় তবুও যেটুকু যেত তাতেও রাজা কিছুই করতে পারতেন না।

রাজার মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনান্তে কিছুই যেন করার থাকত না। মন্ত্রীরা যে ভাবে বোঝাত রাজাকে সে ভাবে বুঝতে হত।

মন্ত্রীরা আবার অন্যদের কাছ থেকে যা শুনত তার থেকে কিছু কমিয়ে রাজাকে জানাত।

দেশের এই রকম অবস্থায় একদিন শঙ্কাবর্মা রাজার কাছে গিয়ে তাকে বলল, "মহারাজ, দেশের তো এই অবস্থা। আপনি বলুন কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

"দেখতে পাচ্ছ না, চোখের সামনে আমার প্রজারা কাতারে কাতারে মারা যাচ্ছে। ক্ষেতে যতদিন না ফসল উঠছে, যতদিন না নতুন ধান উঠছে, ততদিন এদের খাদ্যের অভাব মেটানোর ব্যবস্থাই করতে হবে। প্রজাদের এই চরম অবস্থা আমি চোখের সামনে দেখছি অথচ কিছুই করতে পারছি না। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি থাকতে পারে। এ আমার কাছে অসহ্য। এখন তুমি বল কেমন করে দেশের এই খাদ্যের অভাব মেটানো যায়।" রাজা বলল।

"আমি আপনার প্রজা। দেশের এই সঙ্কটের দিনে আপনাকে কিভাবে কি করতে পারি চেষ্টা করবো। আমাকে মাত্র দুটো দিন সময় দিন। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব কোন উপায় বের করতে।" শঙ্কাবর্মা বলল।

তৃতীয় দিনে আবার শঙ্কাবর্মা এল রাজার কাছে। বলল, "মহারাজ, আমরা পাশের দেশ শক্তিগড় থেকে চাল আনতে পারি। দেশের সীমার ব্যাপারে বিরোধ থাকায় সেখান থেকে চাল আনার অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এখন আপনি রাজী হলে শক্তিগড়ের রাজার কাছ থেকে ব্যবস্থা করে চাল আনা যায়।"

"না, না এ অসম্ভব। আমাদের মান-সম্মান আমরা কিছুতেই খোয়াতে পারি না। শক্তিগড়ের রাজা আমাদের শত্রু। সুতরাং শত্রুর কাছ থেকে চাল আনা যায় না।" রাজা বলল।
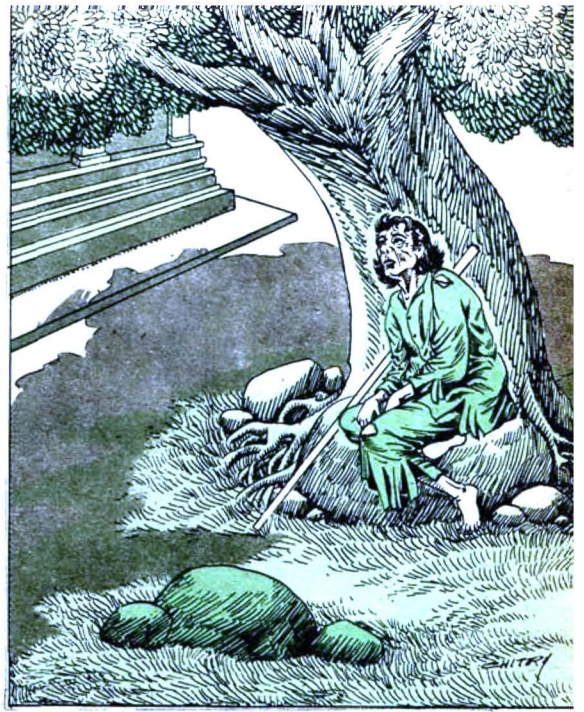
শঙ্কাবর্মা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মহারাজ, আপনার কথাই ঠিক। চাল জোগাড়ের কথা এত বেশি ভেবেছি যে, শক্তিগড়ের রাজা যে আমাদের শত্রু সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এর জন্য আমি ক্ষমা চাই। তবে এই মুহূর্তে আমার মনে আর একটা বুদ্ধি জেগেছে। শক্তিগড়ে আমার শ্বশুর মশাই রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারি যাতে গোপন পথে শক্তিগড় থেকে চাল আনা যায়। এর ফলে এক ঢিলে দুটো পাখি

মরবে। আপনার প্রজারা খেতে পাবে, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে, দেশ থেকে আকাল দূর হয়ে যাবে; আর অন্য-দিকে শক্তিগড়ে, শত্রুর দেশে খাদ্যের অভাবে আকাল দেখা দেবে। তবে গোপন পথে সতর্কতার সঙ্গে এসব কাজ করতে হলে খরচ স্বভাবতই একটু বেশি পড়বে। আশাকরি মহারাজের তাতে আপত্তি থাকবে না।” শঙ্কাবর্মা বলল।

“গোপন পথে কোন কিছু করা সাধারণত আমার মোটেই পছন্দ নয়। তবে প্রজাদের এই অবস্থা দেখে, তাদের মঙ্গলার্থে ও শত্রুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আমি তোমার এই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি। আচ্ছা কত বেশি দাম পড়বে বলে তোমার ধারণা ?” রাজা বলল।

“মহারাজ, কাজটা যেহেতু অত্যন্ত গোপনে করতে হবে সেই হেতু সব মিলিয়ে চারগুণ দামও পড়তে পারে।” শঙ্কাবর্মা বলল।

“না না এত পড়বে কেন ?” রাজা বলল।

“মহারাজ, শক্তিগড়ের রাজা সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরী রেখেছে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে যদি কোন কাজ করতে হয়, স্বভাবতই খরচ বেশি পড়বেই।” শঙ্কাবর্মা বলল।

শঙ্কাবর্মার বাড়ি ছিল শহরের বাইরে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট এক বাড়ি। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভেতরে পুকুর বাগান আর একটা মন্দির। সেই মন্দিরের গা ঘেষে আম আর জামের বহু গাছ।

শঙ্কাবর্মা রাজার কাছে প্রথম দিন যাওয়ার আগে মন্দিরে ঘুরে গেল। তখন সে মন্দির প্রাঙ্গনের এক কোণে গাছতলায় এক গেঁয়ো লোক বসেছিল। তার নাম সত্যকাম। আকালে তার স্ত্রী মেয়ে সব মারা গেছে। জীবনের প্রতি তার কোন দয়া মায়া ছিল না। রাতদিন সে ভাবতে লাগল কেন এমন হল। যেখানে সেখানে সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেদিন ক্লান্ত হয়ে

মন্দিরের কাছে গাছতলায় বসে ছিল। বসে বসে ভাবছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল পিঁপড়ের সারি। অসংখ্য পিঁপড়ে সারিবদ্ধভাবে মুখে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল প্রত্যেক পিঁপড়ের-মুখে চালের দানা। এই চালের অভাবে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার মারা গেছে। সে শুনেছিল এই মন্দির কান এক বিরাট ব্যবসায়ীর।

পিঁপড়ের সারি ধরে সে সামনের দিকে এগিয়ে দেখল ওরা এক বিরাট ঘরের ভেতরে ছোট্ট ফুটো দিয়ে ঢুকছে আর চালের দানা মুখে নিয়ে বেরুচ্ছে।

সত্যকাম আপন মনেই বলে উঠল, "নিশ্চয়ই এই বিরাট ঘরের ভেতরে চাল আছে। তা না হলে পিঁপড়েগুলো এত চাল আনছে কোত্থেকে! এই রহস্যের সন্ধান করতে হবে!"

সেখান থেকে অনেক কষ্টে হাঁটতে হাঁটতে সত্যকাম গেল প্রধান মন্ত্রীর কাছে। তাকে বলল, "মহামন্ত্রী, আমার ধারণা শঙ্কাবর্মার মন্দিরের পাশে এবং নিচে বিরাট গুপ্ত ঘর আছে। আর সেই ঘরে চাল রাখা আছে। আমি দেখেছি হাজার হাজার পিঁপড়ে বিশেষ একটি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের প্রত্যেকের মুখে চালের দানা। চাল না থাকলে এত চালের দানা নিয়ে ওরা আসছে কি করে? আপনারা চলুন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।"
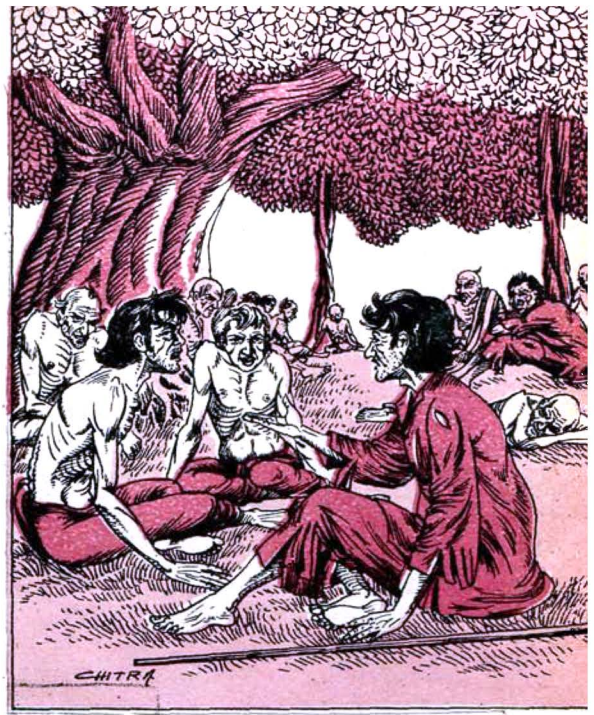
"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? শঙ্কাবর্মা একজন দেশপ্রেমিক ব্যবসাদার। তার বিরুদ্ধে এই সব কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? এতবড় পাপ কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না। এই সব কু-চিন্তা করা তোমার অনুচিত হয়েছে। যাও এখান থেকে।" প্রধান মন্ত্রী ধমক দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ ভাগিয়ে দিল।

সত্যকাম মাথা নিচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে কোতয়ালের কাছে গেল। তার কাছ থেকেও একই রকমের ব্যবহার পেল।

তারপর ঠিক করল আর উচ্চ মহলে ঘোরা-ঘুরি করবে না। এবার সে যাবে প্রজাদের কাছে। দেশের গরিব মানুষের কাছে সে তার মনের কথা বলবে।

দুর্বল শরীরে সে পথ হাঁটে আর গরিব মানুষের কাছে তার মনের কথাটি বলে।

দু-তিন দিন পরে এক জায়গায় দেখতে পেল অনেকগুলো কঙ্কালসার মানুষ বসে বসে ধুঁকছে। তাদের কাছে গিয়ে সত্যকাম যা শুনলো তাতে সে খুব অবাক হয়ে গেল। নিজের কানকেও যেন সে বিশ্বাস করতে পারল না। ওদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করছ ? কি বলছ ?"

"আমরা একজন মহান দেবতা সম্পর্কে আলোচনা করছি।" উনি মানুষ হয়েও দেবতা। যেমন দয়ালু তেমনি দান করেন।" সে লোকগুলো বলল।

"উনি কি চাল অথবা ধান দিয়েছেন ?" সত্যকাম জিজ্ঞেস করল।

"না টাকা পয়সা দেন।" ওরা বলল।

"টাকা পয়সা দিয়ে কি পেট ভরবে ?" না কি টাকা পয়সা নিয়ে আমরা স্বর্গে যাব ?" সত্যকাম বলল।

তারপর ওদের সঙ্গে সত্যকামের অনেক কথাবার্তা হল। শঙ্কাবর্মার বিরুদ্ধে সত্য-কামের কোন কথাই ওরা মানতে রাজী হল না। উল্টে সত্যকামকেই ওরা শুনিয়ে দিল, "আরে মশাই শঙ্কাবর্মা কি করবে ? দেশে ধান চাল থাকলে না হয় বলা যেত ওকে। স্বয়ং আমাদের রাজাই আমাদের বাঁচাতে পারলেন না। আমাদের কপালে যা আছে তাই হবে। কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না।"

সত্যকামও বুঝল এভাবে প্রচার করলে কেউ তার কথায় কান দেবে না। ভাবতে ভাবতে সে অন্য একটা পন্থা বের করল। নতুন উদ্যোগে লোকের কাছে গেল।

"এই যে ভাইসব, আমি আগে জানতাম না সত্য কিভাবে বোঝা যায়। স্বপ্নে দেখলাম একজন আমাকে বলছে, "ওরে

ব্যাটা, আকাল কেন হয়েছে জানিস ? এত বড় যে আকাল হল এর জন্য দায়ী কে জানিস ? শুধু একটি মাত্র লোক এতবড় আকালের জন্য দায়ী। সে লোককে ধরা অত সহজ নয়। লোকটা গোপন জায়গায় ধান চাল সব লুকিয়ে রেখেছে। আমি তোকে একটি বাঁশী দিচ্ছি। ঐ বাঁশীর সাহায্যে তুই আসল অপরাধীকে ধরতে পারবি। সত্য হলে বাঁশী একবার বাজবে, মিথ্যা হলে দুবার বাজবে। তারপর ঘুম ভাঙতেই দেখি একটি বাঁশী আমার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে।" সত্যকাম বলল।

তার কথা শুনে লোকগুলো ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ঐ বাঁশীটি দেখতে চাইল। লোকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বাঁশীটিকে দেখল।

কয়েকজন প্রশ্ন করল, "এই বাঁশী দিয়ে কি করে অপরাধীকে ধরা যাবে ?"

"সেটা কালকে আমি দেখাব। কিন্তু তার আগে তোমরা মুখে মুখে প্রচার করে সবাই এক জায়গায় জড়ো হও।" সত্যকাম বলল।

সত্যকামের পেশা ছিল পুতুল বানানো। নরনারী ও দেব-দেবীর সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাত। তার একমাত্র ছ-বছরের মেয়ের জন্য খেটে খুটে একটা বাঁশী বানিয়েছিল। আকালে মেয়েকে হারিয়ে সে তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঐ বাঁশীটিকে সব সময় কাছে রাখত। বাঁশীটির মজা ছিল যে বাঁশীটিকে

ফুঁ দেবার দরকার হত না। অন্য একটা কায়দা ছিল।

পরিবারের সবাইকে হারানোর পর সত্যকাম পাগলের মত হয়ে গেল। কি করবে কোথায় যাবে কিছুই সে ভেবে পেল না। সজ্ঞানে মাঝে মাঝে সে বুঝতে পারল যে যাদের হারিয়েছে কোন ক্রমেই তাদের ফিরে পাবে না। অবশ্য তার সজ্ঞান অবস্থাও বেশিক্ষণ থাকত না। তার এই অবস্থায় একমাত্র সাথী ছিল ঐ বিচিত্র বাঁশী।

রবারের থলির সঙ্গে একটা নলি ছিল। রবারের থলিটি বগলে ধরে টিপলে নলি দিয়ে বাতাস গিয়ে বাঁশী দিয়ে বেরুত। ফলে আওয়াজ হত বাঁশীতে। সেই থলি

এবং নলি জামার ভেতরে বগলে থাকত। ফলে কেউ তা ধরতে পারত না। এবং বাঁশীর আওয়াজ শুনে অবাক হত।

সত্যকাম জামার ভেতর দিয়ে ঐ থলিটি লুকালো অন্য একটা বাঁশী একটা লাঠির আগায় বেঁধে রাখল। হাত দিয়ে বগল টেপার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হত। আর ঐ আওয়াজ শুনে লোকে ভাবত লাঠিতে বাঁধা বাঁশী থেকেই বুঝি আওয়াজ বেরুচ্ছে।

পরের দিন সমস্ত লোকের যে গাছের নিচে দাঁড়ানোর কথা ছিল, সেখানে সত্যকাম গেল।

সবাই তাড়াতাড়ি তার কাছে এল। ওদের সবাইকে সত্যকাম বলল, "এই বাঁশীর সাহায্যে আজকে আমরা আমাদের দেশের খাদ্য যে লুকিয়ে রেখেছে তাকে ধরতে পারব। কি তোমরা সবাই রাজী তো? রাজী থাকলে তোমরা এক এক করে ঐ সব বড় বড় ব্যবসাদারের নাম বল।"

সবাই একবাক্যে চিৎকার করে বলল, "শঙ্কাবর্মা।"

তখন সত্যকাম বাঁশীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, "বাঁশী তুমি বল শঙ্কাবর্মা কি খাদ্য লুকিয়ে রেখেছে?"

বাঁশী একবার বাজল।

সবাই অবাক হয়ে গেল।

সত্যকাম বাঁশীকে জিজ্ঞেস করল, "শঙ্কাবর্মা কি খাদ্য তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে?"

বাঁশী দু-বার বাজল। তারপর সত্যকাম জিজ্ঞেস করল. "তবে কি মন্দিরের কাছে লুকিয়ে রেখেছে?" বাঁশী একবার বাজল। লোকে ছুটে গেল মন্দিরের কাছে। খুঁজে খুঁজে তারা চালের আড়ত পেয়ে গেল।

রাজা এই খবর পেয়ে শঙ্কাবর্মাকে বন্দী করলো। রাজা জানতে পারলো যে শঙ্কা-বর্মা তার শ্বশুরের সাহায্যে এতবড় সর্বনাশ করেছে। রাজা সত্যকামকে উপহার দিল।
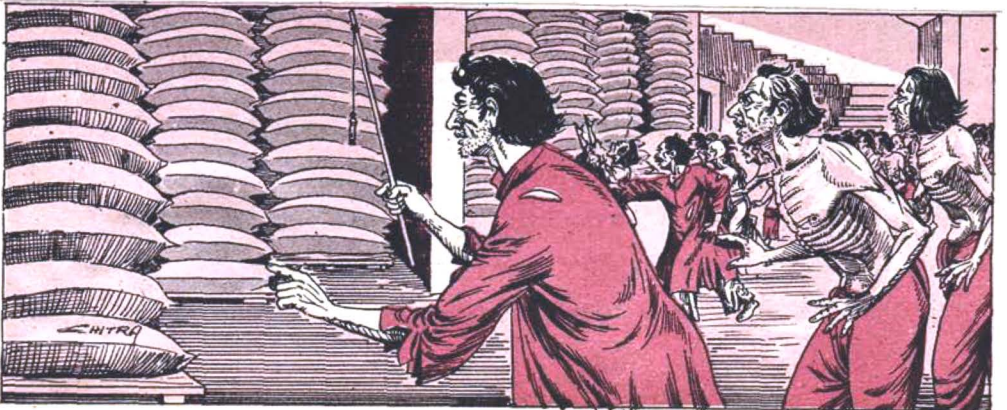
গাধার ছায়া

আরব দেশে কোন এক সময়ে ইব্রাহিম নামে একজন নিজের একটি গাধাকে ভাড়া খাটিয়ে নিজের পরিবার পরিজনদের খাওয়া পরার খরচ চালাত।

একবার দূর দেশের কোন এক যাত্রী তার কাছ থেকে গাধাটাকে কয়েক দিনের জন্য ভাড়ায় নিল।

ইব্রাহিম গাধার সঙ্গে যেত। এবারও গেল।

কড়া দুপুরে ওরা পথ চলা থামিয়ে এক জায়গায় বিশ্রাম করল।

ইব্রাহিম ঠায় দাঁড়িয়ে রইল আর ঐ যাত্রী গাধার গা ঘেষে একটু ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রী ঘুমিয়ে পড়ল। তখন ইব্রাহিম ঐ গাধাটাকে সরিয়ে নিয়ে কাছে সেটাকে দাঁড় করিয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর গায়ে কড়া রোদ লাগায় যাত্রী উঠে দেখে গাধা দূরে সরে গেছে এবং তার ছায়ায় গাধার মালিক শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে সে ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তুলল। দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাধল

"আমি গাধাকে ভাড়া খাটিয়েছি। তার ছায়া নয়।" ইব্রাহিম বলল। দুজনের ঝগড়ার সুযোগে গাধা বোঝাটাকে ফেলে পালিয়ে গেল।
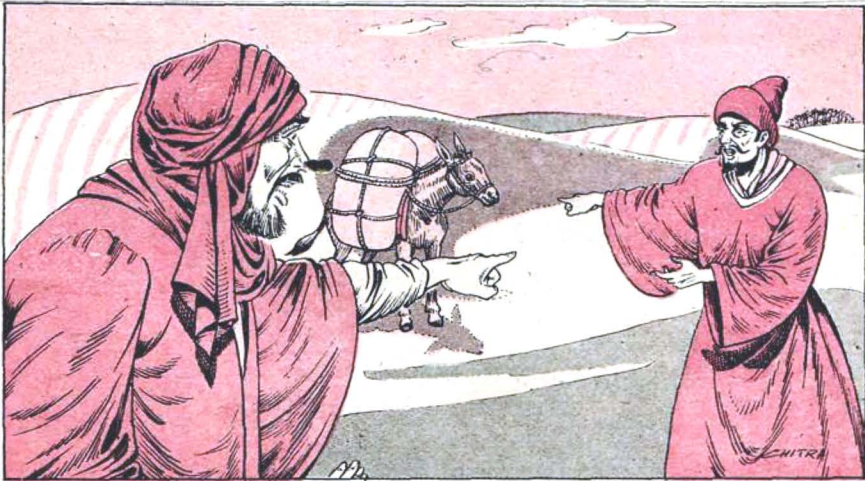
অহঙ্কার

রামগিরি নামক এক গ্রামে শিবজ্ঞান নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তাঁকে বহু লোক মহা-পণ্ডিত হিসেবে গণ্য করত। তাঁর বাড়িতে সব সময় শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হত।

শিবজ্ঞানের পার্বতী নামে এক কন্যা ছিল। মেয়েটি যা শুনত তাই মনে রাখতে পারত। তার বাবা শিষ্যদের যা বলতেন সে তা একবার শুনেই মনে রাখত। শুধু মনে রাখাই নয় তার ব্যাখ্যাও মনে মনে করে নিত। শিষ্যদের বোঝার আগে সে বুঝে নিত। বাড়িতে সব সময় শাস্ত্র আলো-চনা হওয়ায় বাচ্চা বয়স থেকেই সে বড় বড় বিষয়ের আলোচনা শুনতে পেয়েছিল।

সব কিছু জেনেও শিবজ্ঞানের ধারণা ছিল যে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু তাঁর মেয়ে পার্বতী নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করত। একটু বড় হয়ে পার্বতী বড় বড় পণ্ডিতদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করত এবং সকলের প্রশ্নের সমাধান দিত। সব সময় যে সে হাসি মুখে সমাধান দিত তাই নয় অনেক সময় সে রেগে গিয়ে বা বিরক্ত হয়েও প্রতিপক্ষকে যা নয় তাই বলত। তাতে তারা অপমান বোধ করত।

পার্বতীর এই আচরণ দেখে পণ্ডিতগণ ও তার বাবা মনে মনে খুশী হয়ে ভাবতেন মেয়ে বড় হলে নিশ্চয় এইভাবে অহঙ্কার প্রকাশ করবে না। তার মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী ভাব দেখা দেবে। কিন্তু পার্বতী যত বড় হতে লাগল তার অহঙ্কারও তত বাড়তে লাগল।

"বড়দের আলোচনার মধ্যে তুমি নাক গলাও কেন? এরকম করা তোমার অনুচিত হচ্ছে।" শিবজ্ঞান বলল।

পত্রলেখা সেন

"বাবা, বয়সের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের কোন সম্পর্ক নেই। বয়স যতই বাড়ুক না কেন অনেকে মূর্খই থাকে।" পার্বতী জবাবে বলল। তার মনে হল তার বুদ্ধির প্রকাশ ঘটুক তা হয়ত তার বাবা এক্ষুণি চাইছেন না। আরও বড় হলে লোকে জানুক পার্বতী কতখানি পাণ্ডিত্য রাখে।

এদিকে শিবজ্ঞান দিনরাত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না মেয়ের অহঙ্কার কি ভাবে দূর করবেন। শিবজ্ঞান মনের দুঃখ ঘনিষ্ঠ শিষ্যের কাছে প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে নবরাত্রির উৎসব এসে গেল। রাজপ্রাসাদের উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য বহু পণ্ডিত আমন্ত্রিত হয়েছিল। শিবজ্ঞানও আমন্ত্রণ পেলেন।

তাঁর অনুপস্থিতির কালেও তাঁর বাড়িতে যথারীতি পণ্ডিতগণ আলোচনা করত।

একদিন পার্বতীর সামনেই পণ্ডিতরা চিৎকার করে একটি বিষয়ে তর্ক করতে লাগল। তা হলো পুরানো পুকুরের মণ্ডপের দেয়ালে যা লেখা আছে তা কোন পণ্ডিত পড়তে পারছে না।

কথাটা কানে যেতেই পার্বতী তাদের কাছে গিয়ে বলল, "আমি পড়তে পারব। চেষ্টা করলে পড়তে না পারার কোন কারণ নেই।"

তার কথা শুনে কয়েকজন সন্দেহ প্রকাশ করলে পার্বতী জোর দিয়ে বলল, "আমি যদি না পড়তে পারি তাহলে আমি শিবজ্ঞান পণ্ডিতের মেয়েই নই।"
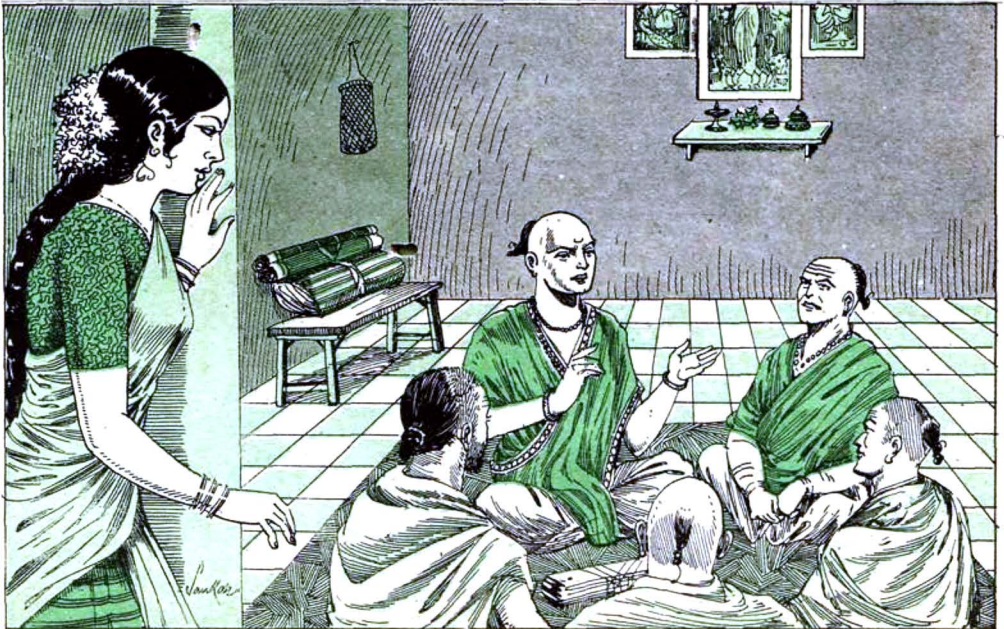
এই খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। পণ্ডিতরা যে লেখা পড়তে পারে না সেই লেখা পার্বতী কি করে পড়বে তা নিয়ে গ্রামের মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা দিল। পার্বতী সেখানে গিয়ে চিৎকার করে দেয়ালের লিখন পড়তে লাগল ঃ

"এই কাজ যে করতে পারবে একমাত্র সেই এই লেখা পড়বে। এই পুকুরে দশ হাত কাদা আছে। আমি এই কাদা কোদাল ও ঝুড়ির সাহায্যে তুলব। আপনারা সবাই আমার এই কাজের সাক্ষী।"

পার্বতীর পড়া শেষ হতেই কে যেন তার সামনে একটা ঝুড়ি ও কোদাল রাখল।

"এ কি এগুলো কি হবে?" পার্বতী বলল।

"পুকুরের কাদা তুলতে লাগবে তো।" সবাই বলল। পার্বতী বলল, "সে কি আমি তো পড়ব বলেছিলাম। আমি কাদা তুলব তো বলিনি।"

"তুমি কি ভেবেছ আমরা পড়তে পারতাম না? আমরা মূর্খ? এতে পরিষ্কার লেখা আছে যে এই কাজ করতে চাও সেই পড়। সেই জন্যই আমরা মনে মনে পড়েছিলাম, শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে পড়িনি। তুমি আমাদের সাক্ষী রেখে পড়েছ বলেই আমরা ঝুড়ি আর কোদাল এনে দিয়েছি।" বুড়ো পণ্ডিতরা বলল।

পার্বতী নিরুপায় হয়ে কাঁদতে লাগল। তখন বয়স্ক পণ্ডিতরা বলল, "প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু জ্ঞান বুদ্ধি থাকে। তাই বলে যখন তখন সেই জ্ঞান প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন হয় না। বুঝেছ?"

শিবজ্ঞান পণ্ডিত রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসে সব শুনলেন। যা ঘটল তার ফলে মেয়ের মধ্যে চমৎকার পরিবর্তন দেখা দেওয়ায় তিনি আরও খুশী হলেন। এইভাবে পার্বতী বিনয়ী হোক এটাই তো শিবজ্ঞান পণ্ডিতের ইচ্ছা ছিল।
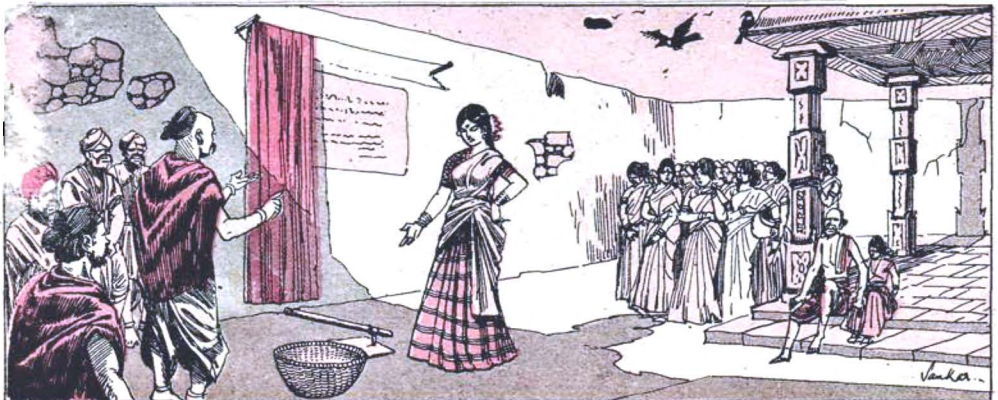
মন্ত্রীর বিচার

কোন এক দেশে খুব তুলো উৎপাদন হত। আশেপাশের দেশে তুলো উৎপাদন না হওয়ায় সে দেশের লোক এসে বেশি দামে তুলো কিনে নিয়ে যেত। ফলে দেশে উৎপন্ন সমস্ত তুলো বিদেশে চালান হয়ে যেত।

এই অবস্থায় দেশের সমস্ত তুলো যাতে রপ্তানী না হয়ে যায় তার জন্য রাজা একজন অধিকর্তা নিয়োগ করল এবং চালানের উপর শুল্ক বসাল। অধিকর্তা কিষাণের সঙ্গে দেখা করল। আস্তে আস্তে তাদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করতে লাগল। যারা ঘুষ দিত তারা যত ইচ্ছা তুলো চালান করতে পারত। নামে একটা শুল্কের খাতা রাখত অধিকর্তা। শুল্কের চেয়ে ঘুষ আদায় করার ব্যাপারেই অধিকর্তা বেশি মাথা ঘামাত। ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন সমস্ত কৃষক একত্র হয়ে উৎপাদন-মন্ত্রীর কাছে গিয়ে অধিকর্তাকে সরাতে বলল। মন্ত্রী শুনে বলল, "খুব ভাল প্রস্তাব করেছ। তোমরা প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে আমার কাছে জমা দাও, এক্ষুনি ওকে সরিয়ে অন্য অধিকর্তাকে বসাচ্ছি।"
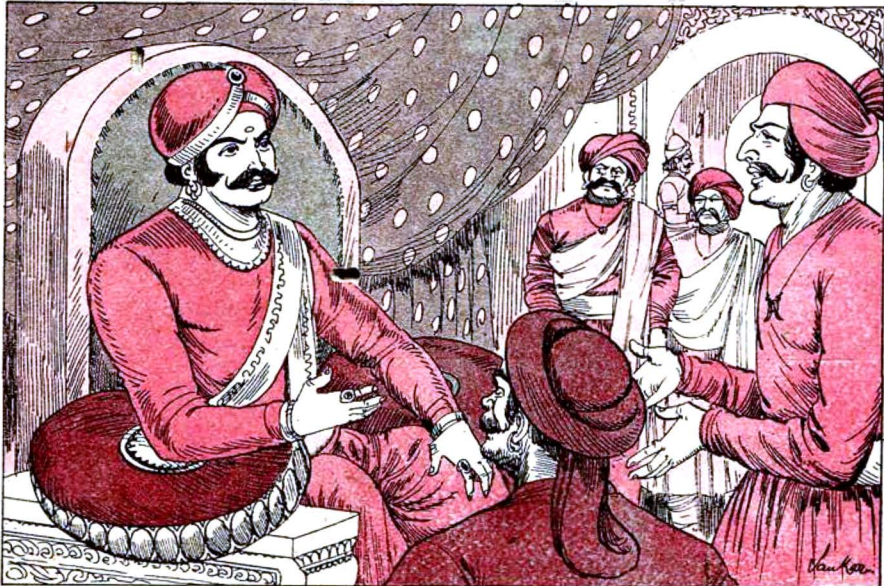
ধর্মদাতা

কোন এক কালে কোশল দেশে সিদ্ধিনাথ নামে এক দানবীর লোক ছিল। প্রত্যেকদিন সে গরিব মানুষকে খাওয়াত। তার দানশীলতার কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিদ্ধিনাথের কাজকর্মের কথা সেই দেশের রাজার কানে গেল। রাজা ভাবল, "এই ধরণের মানুষকে সাহায্য করাও পূণ্য কাজ।" একথা ভেবে রাজা প্রত্যেকদিন সিদ্ধিনাথের কাছে খাদ্যদ্রব্য পাঠাত।

সিদ্ধিনাথের স্ত্রী হংসমতী সমস্ত কাজে তার যোগ্য স্ত্রী ছিল। নিজেদের খাবার থাক বা না থাক অন্যকে খাইয়ে খুব আনন্দ পেত ঐ দম্পতি। ক্রমশঃ ঐ দম্পতির নাম সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রাজা যা পাঠাত তার সবটাই গরিব মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিত।

একবার কোশলরাজ সপরিবারে কাশী গেল। সকালে গঙ্গায় স্নান করার সময় হঠাৎ সেনারা এসে চিৎকার করে হুকুম দিল, "কাশীরাজ আসছেন। তোমরা সব সরে যাও।" বলে ওরা জনতাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল। এই ঠেলাঠেলির মধ্যে কোশলরাজও পড়ে গেল।

এর ফলে কোশলরাজের সেনারা ভীষণ রেগে গিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কোশল-রাজকে কি ভেবেছ? ইনি কম কিসে?"

এই কথা কাশীরাজের কানে যেতেই সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে কোশল রাজকে নমস্কার করে বলল, "আপনি যে সিদ্ধিনাথের দেশের রাজা তা আমার সেনারা টের পায়নি। ক্ষমা করবেন।"

কথাটা কানে যেতেই কোশলরাজের মন খ্যাঁচ করে উঠল। মনে মনে ভাবল,

জীবন কর্মকার

"সে কি আমার পাঠান খাদ্যবস্তু গরিবদের বণ্টন করে সিদ্ধিনাথ আমার চেয়ে নাম করে গেল!" কোশলরাজ কাশীর তীর্থ তাড়াতাড়ি সেরে দেশে ফিরে সিদ্ধিনাথের কাছে খাদ্যদ্রব্য পাঠানো বন্ধ করে দিল।

এতেও কোশলরাজের রাগ দমল না। সে প্রত্যেকদিন বেশি সংখ্যক ভিখিরি বা গরিবকে সিদ্ধিনাথের বাড়ি পাঠাত।

জায়গা জমি যা ছিল সব সিদ্ধিনাথ বিক্রি করে দিল। যারা তার দানধর্মের কাজে শ্রদ্ধাশীল ছিল তারা তাকে সাহায্য করত। সিদ্ধিনাথ তাদের কাছে নিত আর গরিবদের মধ্যে বণ্টন করত।

আস্তে আস্তে দান দক্ষিণা পাওয়াও কমে যেতে লাগল। একদিন কোন রকমে সিদ্ধিনাথ সামান্য চাল সংগ্রহ করতে পারল। সাত সকালে জুটে গেল কুড়িজন অতিথি। সিদ্ধিনাথ ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে।

তখন হংসমতী বিয়েতে পাওয়া শেষ সোনার অলঙ্কারটি স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, "আপনি আর চিন্তা করবেন না। এটা বিক্রি করে এখন কাজ চালান।" সিদ্ধিনাথ স্ত্রীর কথা মত কাজ করল।

তারপর সিদ্ধিনাথের হাতে আর কাণা কড়িও রইল না। সে অগত্যা স্ত্রীকে নিয়ে কাশীর পথে পা বাড়াল।

সেদিন কাশীর পথের একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিল ওরা দুজনে।

ধর্মশালার যাত্রীদের মধ্যে তিনজন যাত্রী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, "আজ-

কালকার দিনে সিদ্ধিনাথের মত দানধর্ম-কারী মহাত্মা প্রায় নেই বললেই চলে। ঐ তিনজন যাত্রী সিদ্ধিনাথকে বলল, "মশাই, আপনি জানেন এখান থেকে সিদ্ধিনাথের বাড়ি কত দূরে ? আমরা তার অতিথি হবো।"
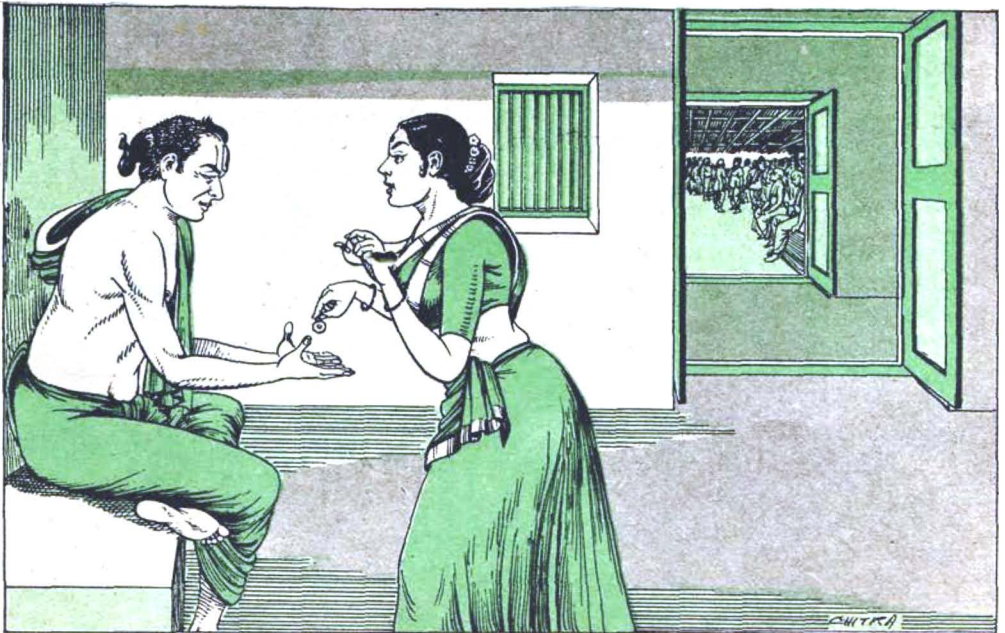
ওদের কথা শুনে সিদ্ধিনাথ ও তার স্ত্রীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ওরা ভেবে পেল না কি বলবে। কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধিনাথ ঐ যাত্রীদের ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলে দিল তার বাড়ির নিশানা।

পরে সিদ্ধিনাথের স্ত্রী হংসমতী বলল, "যা বলার বলা তো হয়ে গেছে। এখন চলুন তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ি পৌঁছে যাই। ওদের যাওয়ার আগে আমরা না পৌঁছালে সব গোলমাল হয়ে যাবে।"

তা না হয় গেলাম। "কিন্তু হাতে তো একটা কাণা কড়িও নেই। কি দিয়ে তাদের খাওয়াব ?" সিদ্ধিনাথ বলল।

"বাড়িতে টুকটাক অনেক লোহার জিনিস আছে সেগুলো বিক্রি করে দিলে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" হংসমতী বলল। দুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেল।

বাড়ি পৌঁছে সব বিক্রি করে দেবার জন্য সব তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে ওরা একটা লোহার রড তুলতে পারল না। মাটির ভিতরে ঢুকে ছিল। মাটি খুঁড়ে ওটাকে বের করতে গিয়ে দেখে তার নিচে অগাধ ধনসম্পত্তি ভরা হাঁড়ি রয়েছে। অত ধন পেয়ে মহানন্দে ওরা ঐ তিন যাত্রীসহ সারা গাঁয়ের লোককে ডেকে খাওয়াল।

এই খবর কোশলরাজের কানে গেল। ঐ রাজা বেশ বুঝতে পারল যে সে না দিলেও সিদ্ধিনাথ ঠিক পেয়ে যাবে। যা ঘটল তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে রাজা আগের মত সিদ্ধিনাথের বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য প্রত্যেক দিন পাঠাতে লাগল।
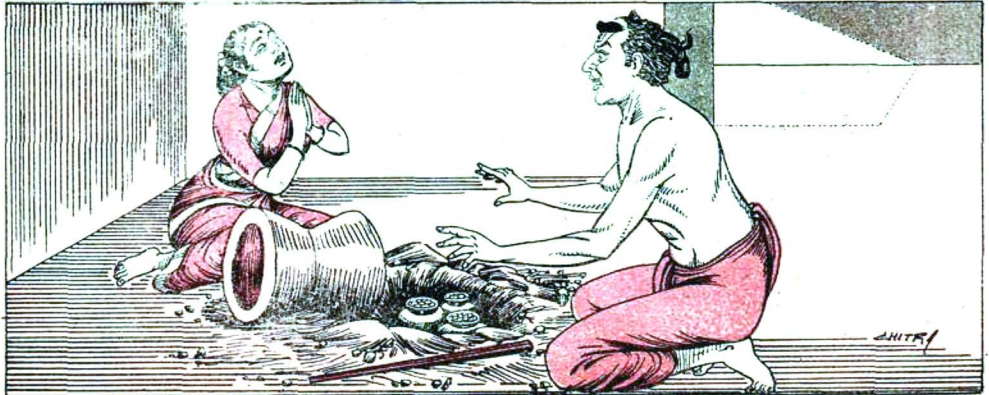
মহাভারত

যুদ্ধের সপ্তম দিন। ভীষ্ম মণ্ডল ব্যূহ রচনা করে সেই ব্যূহে কৌরব সেনাদের দাঁড় করালেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কয়েক হাজার গজ ও রথসেনা নিয়ে ভীষ্মের নির্দেশ পালনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কৌরবদের ব্যূহ দেখে যুধিষ্ঠির বজ্র ব্যূহ রচনা করে নিজের সেনাদের দিয়ে ঐ ব্যূহ সাজালেন। তারপর দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে যোদ্ধারা একে অন্যকে আক্রমণ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে লাগ-লেন দ্রোণ বিরাট রাজার সঙ্গে, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর সঙ্গে, দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে, নকুল ও সহদেব নিজেদের মামা শল্যের সঙ্গে। প্রত্যেকে যুদ্ধ করছে। বিন্দানুবিন্দ এরাবতের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বহু কৌরব সেনারা মরণপণ করে যুদ্ধ করছে অর্জুন ও ভীমের বিরুদ্ধে। কৃতবর্মার বিরুদ্ধেও তাদের লড়তে হচ্ছে। অভিমন্যু যুদ্ধ করছে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র চিত্রসেনের বিরুদ্ধে। ঘটোৎকচ লড়ছে ভগদত্তের সঙ্গে। অলম্বুষ যুদ্ধ করছে সাত্যকির বিরুদ্ধে। ভূরিশ্রবা যুদ্ধ করছে ধৃষ্টকেতুর বিরুদ্ধে। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করছে শ্রুতায়ুর বিরুদ্ধে।

অর্জুনের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়ছিলেন তাঁরা তাঁর উপর তীর বর্ষণ করছিলেন। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের উপর ঐন্দ্রাস্ত্রের প্রযোগ করতে লাগলেন। যার ফলে তাঁরা প্রত্যেকে

গেল। বিরাট অগত্যা নিজের রথ পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি ছেলের রথে গিয়ে উঠ্‌লেন। বিরাটের ছেলের নাম শঙ্খ। তখন একটি মাত্র তীর নিক্ষেপ করে দ্রোণ শঙ্খকে মেরে ফেললেন।

এইভাবে শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর সারথি ও ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। তখন শিখণ্ডী অপূর্ব কৌশলে তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত তীরগুলো তরবারি দিয়ে এড়াতে লাগলেন। শেষে শিখণ্ডীর হাতের তরবারি ভেঙ্গে গেল। তখন ভাঙ্গা তরবারি অশ্বত্থামার উপর ছুঁড়ে ফেলে পালানো ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

ওদিকে অলম্বুষের বিরুদ্ধে সাত্যকি অদ্ভুত কায়দায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। রাক্ষস অলম্বুষ জাদুর যুদ্ধ শুরু করে দিল। তখন সাত্যকি অর্জুনের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রের প্রয়োগ করলেন। তখন অলম্বুষ শোচনীয়ভাবে আহত হলেন।

অপরদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধরত ছিলেন দুর্যোধনের বিরুদ্ধে। তিনি দুর্যোধনকে শর বর্ষণে ঢেকে ফেললেন। প্রথমে তিনি দুর্যোধনকে আহত করে তারপর তাঁর রথের ঘোড়াদের মেরে ফেললেন। তখন নিরুপায় হয়ে দুর্যোধন তরবারি হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আহত হল। অর্জুনের তীর শত্রুসেনাদের মধ্যে বর্ষিত হতে লাগল। তখন কৌরব সেনার বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসে ভীষ্মের শরণাপন্ন হল।

এভাবে পালিয়ে আসাদের মধ্যে সুশর্মা ছিলেন মূখ্য। দুর্যোধন সুশর্মাকে পাঠাতে পাঠাতে বললেন, "ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করছেন। তোমরা সবাই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাও।"

কৌরব সেনাদের উপর তীর বর্ষণ হওয়ার খবর পেয়ে ভীষ্ম অর্জুনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে দ্রোণের অস্ত্রের আঘাতে বিরারেট সারথি ও তাঁর রথের ঘোড়া মারা

ইতিমধ্যে শকুনি এসে দুর্যোধনকে নিজের রথে বসিয়ে নিয়ে গেলেন।

কৃতবর্মা ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। এই যুদ্ধে উনি ভীমের উপর আঘাত হেনে নিজেও আহত হলেন। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘোড়া খুইয়ে নিজের শালা কৃষকের রথের উপর গিয়ে উঠলেন। এই ঘটনা দুর্যোধনের চোখের সামনেই ঘটে গেল। তখন ভীম কৌরব সেনাদের তাড়া করলেন।

অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জুন-পুত্র ইরাবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইরাবানের মায়ের নাম উলুপী। ইরাবানের নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বিন্দানুবিন্দ পর্যুদস্ত হল। অনুবিন্দের চারটি অশ্বই নিহত হল। তিনি অগত্যা বিন্দের রথে গিয়ে উঠলেন। তখন ইরাবান বিন্দের সারথিকে বধ করলেন। সারথি মারা যাওয়ার পর রথের অশ্বগুলো দিগবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল।

ভগদত্তের সঙ্গে ঘটোৎকচের বিচিত্র এক যুদ্ধ হল। ভগদত্ত বিরাট এক হাতীতে চড়ে হঠাৎ পাণ্ডবসেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ এভাবে হাতী নিয়ে আক্রমণ করায় পাণ্ডবসেনারা এদিক ওদিক পালাতে লাগল। তখন ঘটোৎকচ বিচিত্র এক ভঙ্গীমায় কোথায় চলে গেলেন। কৌরবসেনাদের মধ্যে আর্তনাদ উঠল।

ঘটোৎকচ আবার দেখা দিয়ে ভগদত্তের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। ভগদত্তও ঘটোৎকচকে তীরে তীরে বিক্ষত করতে সক্ষম হলেন। তখন ঘটোৎকচ ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধ ভূমি থেকে সরে গেলেন।

নকুল এবং সহদেব তাদের মামা শল্যকে বিচিত্র কায়দায় যুদ্ধ করে পরাস্ত করতে পারলেন। প্রথম দিকে শল্য হাসতে হাসতে নকুলের রণধ্বজ ও ধনু ছিন্ন করে তার সারথি ও অশ্বকে নিপাতিত করলেন। নকুল তখন তাড়াতাড়ি সহদেবের রথে গিয়ে উঠলেন। তক্ষুনি সহদেব তীব্রবেগে এক শর নিক্ষেপ করে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন। শল্য অচেতন হয়ে রথের মধ্যে

পড়ে গেলেন। সারথি অচেতন শল্যকে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে চলে গেল।

চেকিতান ও কৃপাচার্যের রথ নষ্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা পরস্পরের খড়্গাঘাতে আহত হয়ে মূর্ছিত হলেন, শিশুপাল পুত্র করকর্ষ ও শকুনি নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন।

সুশর্মার বহু আপনজন অর্জুনের হাতে মারা গেল। এর ফলে ভীষণ ভাবে রেগে গিয়ে অর্জুনের উপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সদলবলে। অর্জুন ওদের সবাইকে পরাস্ত করে ভীষ্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। অর্জুনকে অনুসরণ করলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব। পাঁচ ভাইয়ে মিলে ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও সুবিধা করতে পারলেন না।

যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে শিখণ্ডীকে বললেন, "শিখণ্ডী তুমি কি ভুলে যাচ্ছ তোমার বাবার সামনে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে? ভীষ্মকে বধ করার কথা ভুলে গেছ? প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়া উচিত নয়? নিজের ধর্ম, যশ ও কুল মর্যাদা রক্ষা করার ভার তোমার। ভীষ্মের কাছে পরাস্ত হয়ে তুমি এতটা নিরুৎসাহ হয়ে গেলে? ভাই এবং বন্ধুদের ছেড়ে যাচ্ছ কোথায়? বীর হিসাবে তোমার নাম আছে সে কথা মনে রেখ। ভীষ্মকে তুমি এতটা ভয় করবে ভাবতে পারিনি।"

যুধিষ্ঠিরের কথায় লজ্জা পেয়ে শিখণ্ডী আবার ভীষ্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। পথে শল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করে শিখণ্ডীকে পর্যুদস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু শিখণ্ডী বরুণাস্ত্র দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিহত করলেন।

ইতিমধ্যে মহানন্দে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের ধনুক ও ধ্বজা ভেঙ্গে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ভীমের পৌরুষ জেগে উঠল। ভীম প্রবল বিক্রমে সৈন্ধবের উপর গদা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সৈন্ধব ভীমের উপর তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভীমের গদার আঘাতে সৈন্ধবের মৃত্যু হল।

ঐ গদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৌরবসেনারা পালাতে লাগল।

এদিকে শিখণ্ডী ভীষ্মের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "সা ধান !"

কিন্তু ভীষ্মের মনে পড়ে গেল যে শিখণ্ডী নারী। তাই তিনি ঐ কথায় কান দেননি।

সূর্যাস্ত হল। পাণ্ডব ও কৌরব সেনারা নিজের নিজের শিবিরে ফিরে গেল। দেহে বিদ্ধ বাণাগ্র তুলে ফেলতে লাগল। তার পর ওরা স্নান করতে লাগল। গায়করা গান করল। বাদকেরা বাজাল। সবাই সেদিন রাত্রে শিবিরে মেজাজে ছিল। কেউ যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করল না। তারপর এক সময় যে যার শিবিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

যুদ্ধের অষ্টম দিন। ভীষ্ম কূর্ম ব্যূহ রচনা করলেন। আর ধৃষ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করলেন। উভয় শিবিরের যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরে আহ্বান করতে লাগলেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে। ভীষ্ম পাণ্ডব সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের ভ্রাতা সুনাথ অপরাজিত কুণ্ডধার পণ্ডিতক বিশালাক্ষ মহোদর আদিত্যকেতু ও বহ্বাশী ভীমের হস্তে নিহত হলেন। ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে বিলাপ করতে লাগলেন।

ভীষ্ম বললেন, "বৎস, আমি দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝনি। একথাও তোমাকে পূর্বে বলেছি যে আমি বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব, তুমি স্থিরভাবে দৃঢ়চিত্তে স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর।"
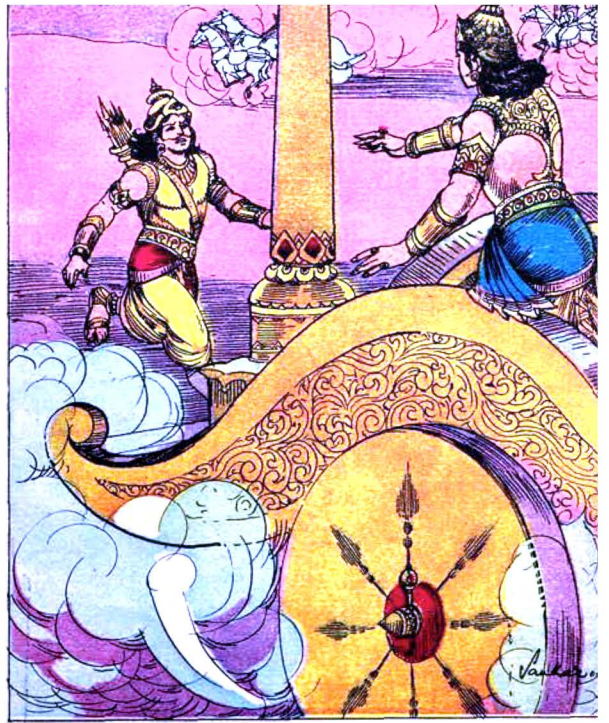
অর্জুনপুত্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। কাম্বোজ, সিন্ধু প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করে চলল। এই ইরাবান নাগরাজ ঐরাবতের দুহিতার গর্ভে অর্জুনের ঔরসে জন্মেছিলেন। ঐরাবত দুহিতার পূর্বপতি গরুড় কর্তৃক নিহত হন। তারপর

ঐরাবত তাঁর শোকাতুরা অনপত্যা কন্যাকে অর্জুনের নিকট অর্পন করেন। কর্তব্যবোধে অর্জুন সেই কামার্তা পরপত্নীর গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। এই পুত্রই ইরাবান। ইনি নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অর্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশত এঁর পিতৃব্য দুরাত্মা অশ্বসেন এঁকে ত্যাগ করেন। অর্জুন যখন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা করছিলেন তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেন। অর্জুন তাঁকে বলেছিলেন, "যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য করো।"

গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্মবান, আর্জক ও শুক–শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে ইবাবানের যুদ্ধ হল। ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। গজ, গবাক্ষ, প্রভৃতি ছজনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, "অর্জুনের এই মায়াবী পুত্র আমার ঘোর ক্ষতি করছে, তুমি একে বধ কর।"

দুর্যোধনের ক্রুদ্ধ হওয়ার আরও কারণ ছিল। ভীষ্ম সোমক সঞ্জয় প্রভৃতিদের বধ করতে লাগলেন। ভীম যে প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ করতে লাগলেন তাতে মনে হল তিনি ভীষ্মের চেয়ে কোন অংশে কম নন। উগ্ররূপ ধারণ করে ভীষ্মের সারথিকে মেরে ফেলে তাঁর রথ যাতে যুদ্ধ ভূমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করলেন। শেষে ভীষ্মকে যিনি সাহায্য করছিলেন সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সুনাথকে বধ করলেন।

এই দারুণ অবস্থা দেখে ধৃতরাষ্ট্রের আরও সাতটি পুত্র—আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত ও বিশালাক্ষ ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। ভীম ঐ সাত জনকেও বধ করলেন। তখনও দুর্যোধন রাগে দুঃখে অভিমানে ভীষ্মকে বলেছিলেন, "পিতামহ, এক এক করে আমার সমস্ত ভাই যে মারা যাচ্ছে। যে ভাই সাহস করে এগোচ্ছে, সেই ভীমের গদার আঘাতে মারা যাচ্ছে। আপনি বোধ হয় আমাদের এই যুদ্ধের ব্যাপারে ততটা
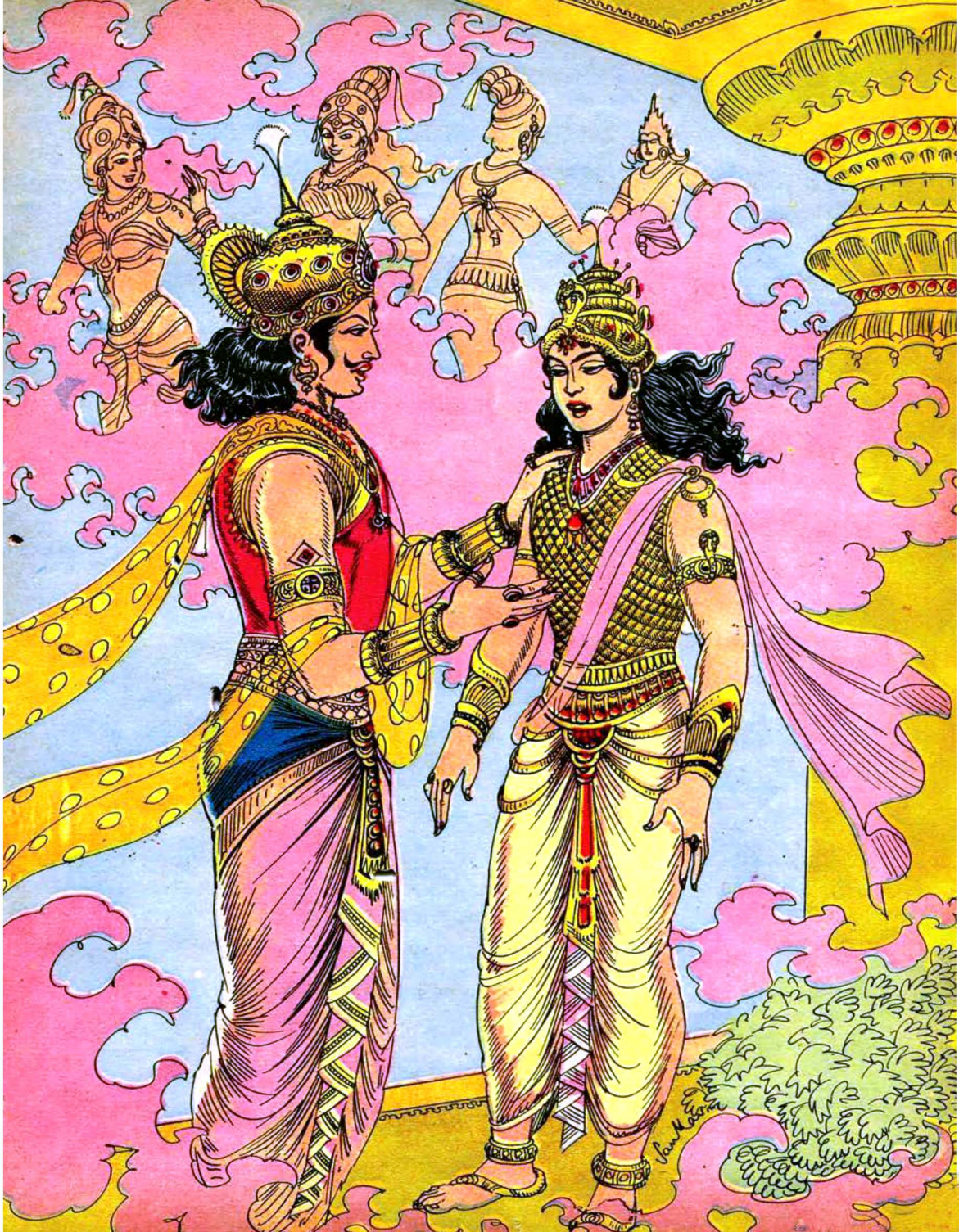
মনোযোগী হতে পারছেন না। এসব কিছু আমার কাছে ভাল লাগছে না।" বলতে বলতে দুর্যোধন যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

দুর্যোধনের কথা শুনে ক্রন্দনরত ঐ যোদ্ধাকে ভীষ্ম বহুবার কথিত যে বাক্য-সমূহ বলেছিলেন, তাতে দুর্যোধনের আশার পরিবর্তে নিরাশাই জেগেছিল বেশি।

দুপুরের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। প্রবল বিক্রমে যুদ্ধরত ভীষ্মের বিরুদ্ধে একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী সদলবলে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন।

একই ভাবে বিরাট ও দ্রুপদ সোমকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের সকলের লক্ষ্যস্থল ভীষ্মকে আঘাত করা। আরও এসেছিলেন কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজ সেনাবাহিনী নিয়ে। এঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন ভীষ্মকে পর্যুদস্ত করতে।

অর্জুন, উপপাণ্ডব চেকিতান প্রমুখ অন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অন্য দিক থেকে কৌরবদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অভিমন্যু, ভীম এবং ঘটোৎকচ।

যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ভীমের হাতে আহত কৌরবসেনারা হাহাকার করতে লাগল। আবার দ্রোণের হাতে ধরাশায়ী পাণ্ডবসেনাদের আর্তনাদের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরে উঠেছিল।

এরকম এক অবস্থায় বহু প্রচণ্ড শক্তি-শালী যোদ্ধাদের নিয়ে অলম্বুষ ইরাবানকে আক্রমণ করলেন। দুজনের মধ্যে চলতে লাগল মায়াযুদ্ধ। ইরাবান অনন্তনাগের মত বিরাট এক মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর মায়ের বংশীয় বহু নাগ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তখন অলম্বুষ গরুড়ের রূপ ধারণ করে সেই নাগদের খেয়ে ফেললেন। এতে ইরাবান অজ্ঞান হলেন। তক্ষুনি অলম্বুষ খড়্গাঘাতে তাঁকে বধ করলেন।
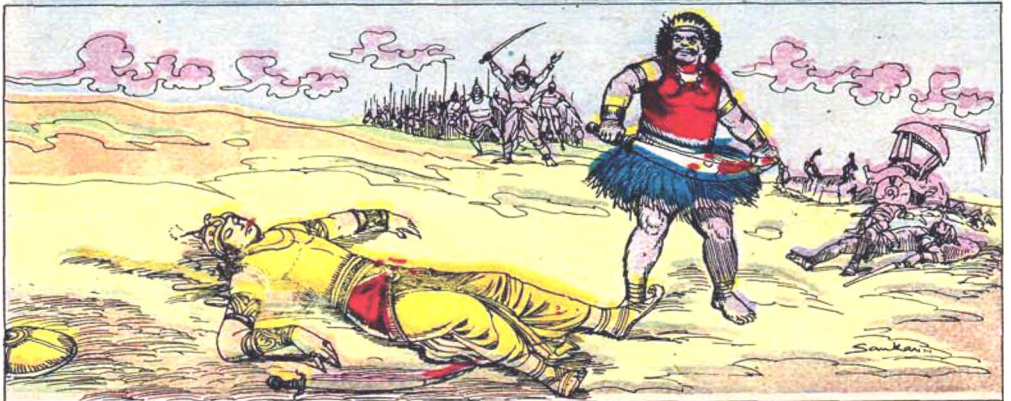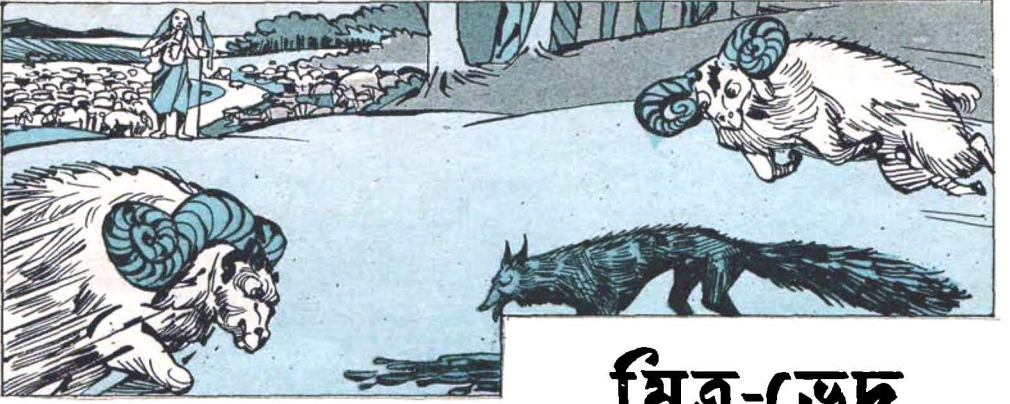
মিত্র-ভেদ

ছয়

করটক দমনককে আষাঢ়ভূতির পালানোর বার্তা শুনিয়ে পরের অংশ বলল ঃ আষাঢ়ভূতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় দেবশর্মা প্রাতঃকৃত্য সারতে দূরে গেল। ভেড়ার পাল চরছিল। তাদের মধ্যে দুটো ভেড়া লড়ছিল। দুটো ভেড়াই দ্রুত পিছনের দিকে চলে যায়। পরক্ষণেই এসে মাথা ঠোকাঠুকি করে। এইভাবে মাথা ঠোকাঠুকি করার সময় ওদের মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে থাকে। নিচে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। একটি শেয়াল সেই রক্ত চেটে চেটে খেতে থাকে।

দেবশর্মা এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বলে ওঠে, "এই শেয়ালটা কী বোকা! দুই ভেড়ার লড়াইয়ের মাঝে পড়ে শেয়াল না চেরাচ্যাপ্টা হয়ে মারা যায়।"

দেবশর্মা যা ভেবেছিল তাই হল। যে শেয়াল মনের আনন্দে রক্ত চাটছিল সে দুটো ভেড়ার আঘাতে মারা গেল। মৃত শেয়াল সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে দেবশর্মা শিষ্যের কাছে গেল। দেখা গেল সেখানে আষাঢ়ভূতি নেই। ঘাবড়ে গিয়ে দেবশর্মা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খোঁজ করে দেখে তার জামা কাপড়ের সেই পোঁটলাটা নেই। সোনার পোঁটলাও নেই।

"উফ্! আমার সোনার পোঁটলা হারিয়ে গেল গো!" বলে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

যখন জ্ঞান হল তখন সে বলতে লাগল, "ওরে আষাঢ়ভূতি, আমাকে ধোকা দিয়ে কোথায় গেলি রে বাবা, চলে আয়, ফিরে আয় বাবা, পাগলামী করিসনি রে! ওরে আষাঢ়ভূতি!" তারপর সে আষাঢ়ভূতির পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে এক গ্রামে ঢুকে গেল দেবশর্মা। সেখানে এক জেলেদম্পতি তাড়ির দোকানের দিকে যাচ্ছিল। দেবশর্মা তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, এখানে আমার চেনাজানা কেউ নেই। আমি তোমাদের বাড়িতে শুধু আজকের দিনটা অতিথি হিসেবে থাকতে চাই। কাল সকালেই আমি চলে যাব।"

দেবশর্মার কথা শুনে জেলে তার বউকে বলল, "এই শোন, এঁকে ঘরে নিয়ে যাও। এঁর পা ধুয়ে খাবার খেতে দিও। এঁর শোয়ার জন্য বিছানা করে দিয়ে এঁর পরিচর্চা কর। ঘরেই থেকো। কোথাও যেয়ো না। আমি তোমার জন্য মাংস আর তাড়ি নিয়ে আসব! যাও, এঁকে নিয়ে যাও।"

জেলের ঐ বউটা ছিল অসতী। ঐ কুলটা জেলেনী মনে মনে একটা ব্যাপারে খুশী হল। সে ঠিক করে নিল ঘরে দেবশর্মাকে রেখে তার প্রেমিক দেবদত্তের কাছে চলে যাবে। চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল। এইসব ভাবতে ভাবতে সে গেল ঘরে দেবশর্মাকে নিয়ে।

ঘরে ঢুকে একটা ভাঙ্গা খাটিয়ায় দেবশর্মাকে বসতে দিয়ে জেলেনী বলল, "আমার এক বান্ধবী আজ গাঁয়ে ফিরেছে। তার সঙ্গে দুটো কথা সেরে এক্ষুণি ফিরছি। আমার আসা পর্যন্ত আপনি এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না?" একথা বলে ভাল ভাল গয়না, জামা আর শাড়ী পরে সে দেবদত্তের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু পথে হঠাৎ তার স্বামী সামনে পড়ে গেল। তার এক হাতে তাড়ির পাত্র। তার পা টলছে। মাথার চুল এলোমেলো। মুখে যা আসছে তাই বকছে। স্বামীকে এভাবে টলতে টলতে আসতে দেখে সে

পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি হেঁটে ছুটে ঘরে ফিরে কাপড় বদলে নিল। গয়না নাবিয়ে রেখে দিল।

জেলেটা পথে বউকে দেখে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করল। কোন কথা সে পথে বলল না। কারণ তার বউয়ের চালচলন যে ভাল নয় তা সে আগেই জানত। ঘরে ফিরে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কুলটা, পাজী মেয়ে, কোথায় যাচ্ছিলি বল ? বল তাড়াতাড়ি ?"

কী যা তা বকছ ? সেই থেকে আমি ঘর ছেড়ে এক পা নড়িনি। নেশায় আছতো কিছুই টের পাচ্ছ না। নেশা থাকলে কি আর বুদ্ধি থাকে।" বলল তার বউ।

জেলে বুঝল যে তার বউ তার কাছে মিথ্যা কথা বলছে। সে বুঝে নিল বউ তাড়াতাড়ি ফিরে কাপড় বদলে ফেলেছে। রাগে গজ গজ করতে করতে বলল, "তোমার সম্পর্কে আগেই আমি শুনেছি। তোমার মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাওনি ?" বলে একটা লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে মেরে তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ল। নেশার চোটে ঘুম তার গাঢ় হয়ে গেল।

জেলেনীর বান্ধবী ছিল এক নাপতিনী। সে হাঁকপাক করে এসে জেলেকে নাক ডেকে ঘুমোতে দেখে জেলেনীকে বলল,

"দেবদত্ত তোমার অপেক্ষায় ঠায় বসে আছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও।"

"যাব কি করে ? দেখছ না কিভাবে বেঁধে রেখেছে। আর ঘরেই তো আমার স্বামী ঘুমোচ্ছে।" বলল, জেলের বউ।

"আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। তোমার স্বামী যেভাবে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে, ওর ঘুম কাল সকালের আগে ভাঙ্গবে না। তুমি যাও। আর যদি তোমার খুব বেশি ভয় করে তো আমাকে এখানে বেঁধে রেখে যাও। আমাকে দেখে নেশার ঘোরে তুমিই আছ ভাববে। ইতিমধ্যে তুমি দেবদত্তের কাছ থেকে ঘুরে এস।" বান্ধবী বলল।

জেলেনী নিজের বাঁধন খুলিয়ে তার জায়গায় নাপতিনীকে বেঁধে দেবদত্তের কাছে চলে গেল।

জেলেনী যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে জেলে ঘুম থেকে উঠে বলল, "পাজী হারামজাদী বল আর কোনদিন যাবি ? বল ?"

নাপতিনী ভাবল ও যদি কথা বলে তাহলে ধরা পড়বে। তাই জেলে যত কথাই বলুক না কেন ও কোন জবাব দিল না। ফলে জেলের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা দা বের করে নাপতিনীর নাক কেটে দিয়ে বলল, "নে এবার বোঁচা নাক নিয়ে কোথায় ঘুরবি ঘোর।" বলে জেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সোনা হারিয়ে দেবশর্মার চোখে এমনিতেই ঘুম ছিল না। সে আড়াল থেকে এই সমস্ত ঘটনা দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে জেলেনী দেবদত্তের কাছ থেকে ফিরে এসে নাপতিনীকে জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছ তো ? হারামজাদাটা এর মধ্যে ওঠেনি তো ?"

"ভাল আছি না ছাই। তোমার স্বামী দেখ আমার নাক কেটে কি কাণ্ড করেছে। নাও এখন আমার বাঁধন খোল না হলে হয়তো এবার কান দুটোকেও হারাতে হবে।" নাপতিনী বলল।

নাপতিনীর বাঁধন খুলে সেই জায়গায় নিজেকে বাঁধিয়ে নিল জেলেনী। ভোর হল। জেলেনী চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে পৃথিবী, হে সূর্য চন্দ্র, আমি যদি সতী হই আমার নাক যেন ঠিক হয়ে যায়। আমার নাক যেন আগের মত হয়ে যায়।" তার চিৎকারের ফলে জেলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেলের ঘুম ভাঙতে সে বড় বড় চোখে দেখল, তার বউয়ের নাক ঠিক আছে। তখন সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। বউকে সতী ভাবল। নিজের হাতে নিজের কান মলে ক্ষমা চাইল।

উঁচু চিমনি

মণ্টানার (আমেরিকায়) আনকোণ্ডার একটি পাহাড়ের উপর কাঁচা তামা গালানোর ভাটি আছে। পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু চিমনি দিয়ে এই ভাটির ধোঁয়া বের করে দেওয়া হয়। এই চিমনির উচ্চতা ৫৮৫ ফুট। মাঝে মাঝে ইন্সপেক্টরদের এই চিমনির উপরে উঠতে হয়। চিমনির উপরে উঠে গেলে অথবা উঠার সময় ওদের কাছে মনে হয় যেন চিমনিটা দুলছে। অথচ এই চিমনি ইট দিয়ে তৈরি। এর ভিতর দিয়ে যে ধোঁয়া বেরোয় তা বিষাক্ত।

ফটো : প্রাণলাল কে. প্যাটেল
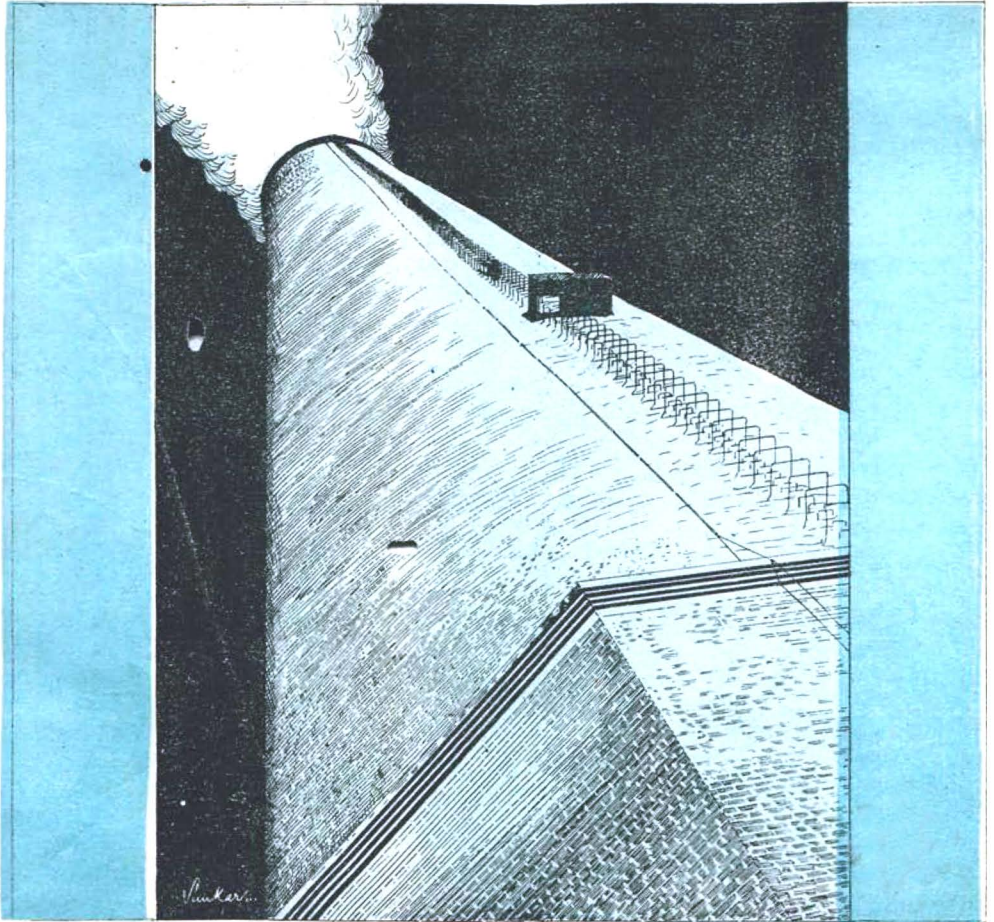
পুরস্কৃত নাম

ফুলের মাঝে ভারি মজা

পুরস্কার পেলেন মনোরঞ্জন সরকার

ফটো : নিবাস যাদব

রামনগর, ইছাপুর
২৪ পরগণা

ভুট্টা রাজ্যে আমি রাজা

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৪-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো এপ্রিল '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

কাজের অন্য নাম জীবন

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

ভ্রমণও কাজের অঙ্গ

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor : 'CHAKRAPANI'
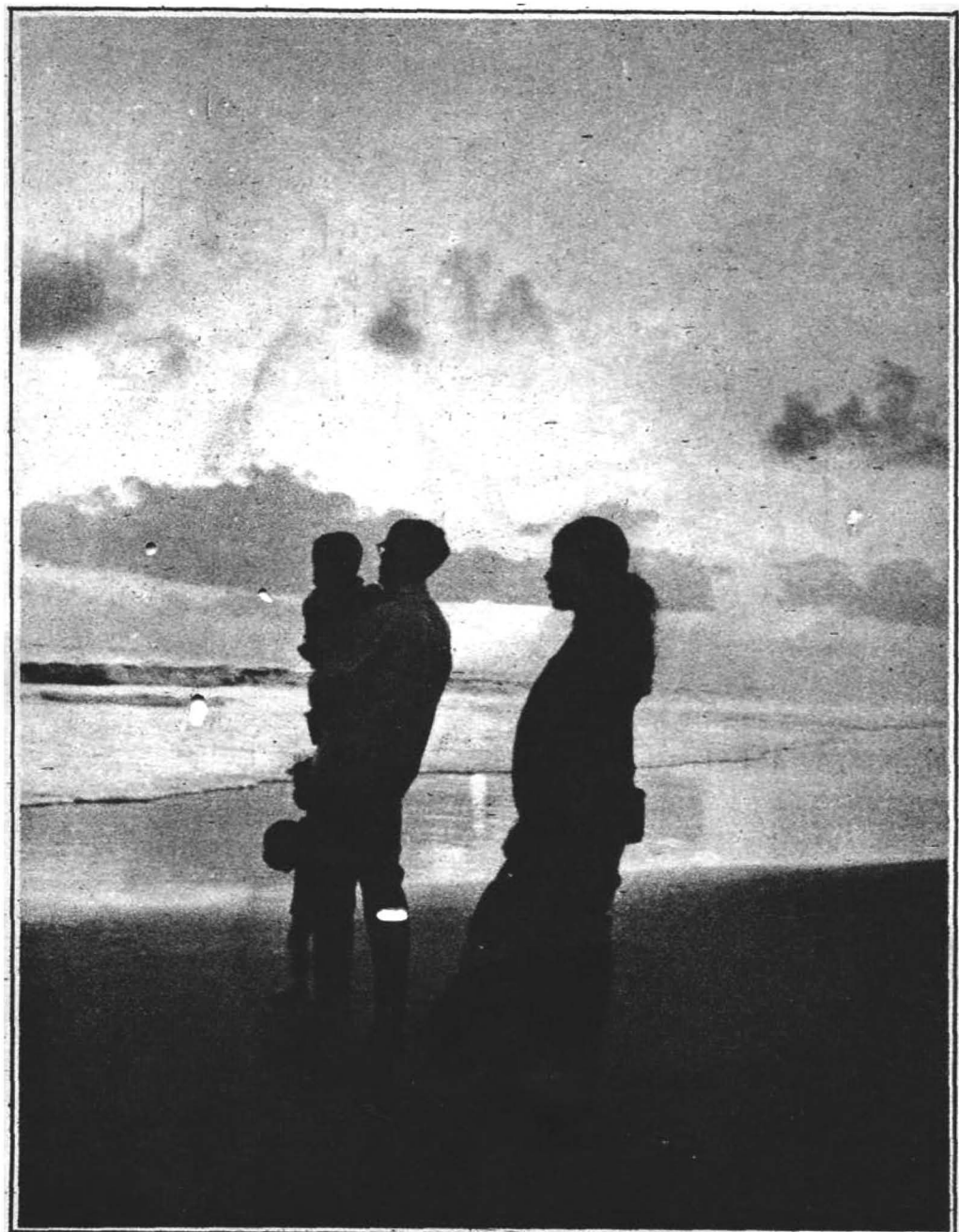
Photo by: SAMBHU MUKHERJEE

মিত্রভেদ